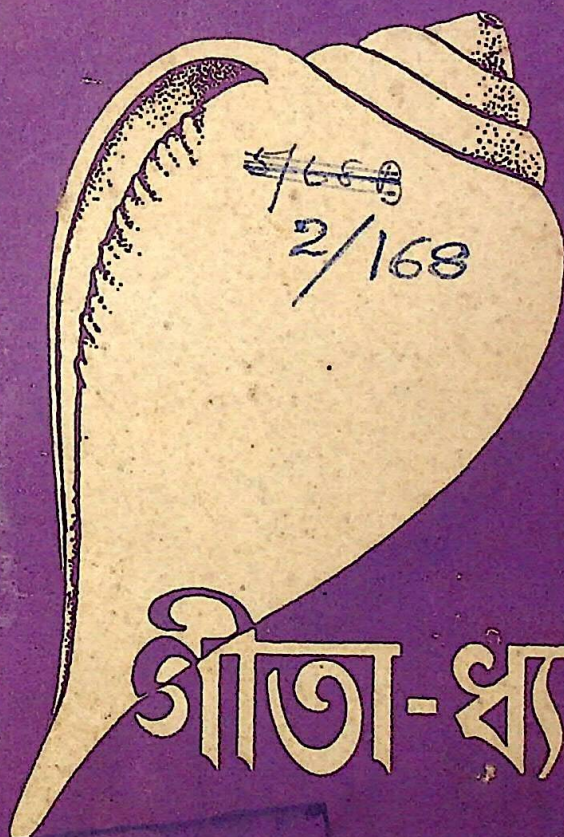


SP

1-3



গীতা-ধ্যান

No.

পঞ্চম খণ্ড

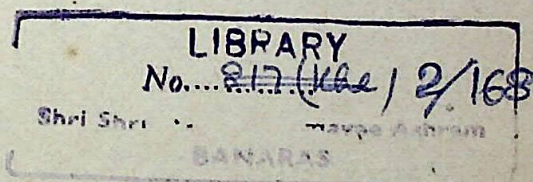
মহানামব্রত
ব্রহ্মচারী

2. 8 - 1/3

~~5768 B~~
2/168

গীতা-ধ্যান

পঞ্চম খণ্ড



“যো মামেবমসংযুতো জানাতি পুরুষোত্তমম্
স সর্ববিদ্বজ্জতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥”

দাস—

হুহানামকুও বৃহাচারী

মূল্য—২.৫০পয়সা

প্রকাশক :—

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

সুদর্শন সম্পাদক

সন্ত আশ্রম,

কল্যাণী (নদীয়া)

প্রথম সংস্করণ

খ্রীষ্টাব্দে নবমী ১৩৭১

দ্বিতীয় সংস্করণ

মহালয়া ১৩৭২

তৃতীয় সংস্করণ—রাসপূর্ণিমা ১৩৭২

মুদ্রাকর :—

শ্রীশঙ্করচরণ ঘোষ

রাণীশ্রী প্রেস

৩৮ নং শিবনারায়ণ দাস লেন

কলিকাতা—৬

তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

গীতাধ্যান পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বর্তমান সংস্করণ (৫ম খণ্ড) প্রকাশ করিতে নানাবিধ কারণে বিলম্ব হইল। শ্রদ্ধেয় ডঃ ব্রহ্মচারিজীর গীতাধ্যান (৬ষ্ঠ খণ্ড) যে কত জন-প্রিয়তা অর্জন করিয়াছে তাহার যথেষ্ট পরিচয় এই সময়ের মধ্যে আমরা পাইয়াছি।

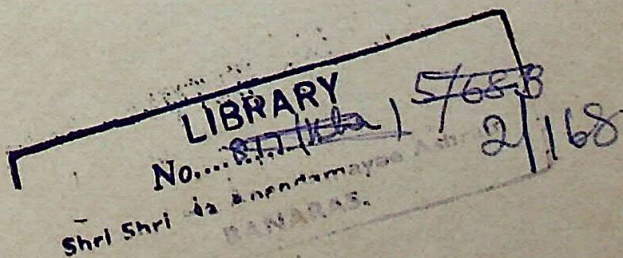
এই সংস্করণটি বাহাতে নিভুল হয় সেইরূপ চেষ্টা যথাসাধ্য করা হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির ন্যায় এটিও গীতাপাঠেছু ভক্তমণ্ডলীর প্রত্যাশা পূর্ণ করিতে পারিবে। গীতার আদর্শ মানব জীবনে মূর্তিলাভ করুক ইহাই শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা।

ছাপা ও কাগজের ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও ও সর্বসাধারণের সুবিধার্থ বর্তমান সংস্করণের মূল্য বর্দ্ধিত না করিয়া পূর্বের স্থলভ মূল্যেই দেওয়া হইল। ইতি

বিগীত :

রাসপূর্ণিমা—১৩৭৯

প্রকাশক



উৎসর্গ

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্কচািরিত্তে স্থিতঃ ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥

শ্রীগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের এই বাণীটির মূর্ত্তি দেখিযাছি য়াহার জীবনে

গীতাকারের “ষদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি”

শ্রীবন্ধুহৃন্দরের “ব্রহ্মচর্য্য করিও, করাইও”

এই মহা নির্দেশ পালনে য়াহার সারা জীবন সত্যাহুসঙ্কী,

প্রেমঘনবিগ্রহ শ্রীশ্রীবন্ধুহৃন্দরকে

জীবনের ধ্রুবতারা জানিয়া তাঁহার সেবায় য়িনি

“সর্ব্ববিভক্ততি মাং সর্ব্বভাবেন” বাক্যের রূপ দিয়াছেন,

য়াহার মহাযাত্রার পূর্ব্বরাত্র পদোপান্তে ধন্য হইয়াছি,

অবিশ্রাম হরিকথা বদনে অথচ বক্ষঃ ও নাড়ী নিম্পন্দ,

জড়-বিজ্ঞানের এই মহাবিস্তাতি য়াহার দেহে প্রত্যক্ষ করিয়াছি,

আগানে য়াহার বদনের উজ্জলতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ভাবিয়াছি,—

বুঝি বা ভক্ত না চাহিলেও তাঁহার আরাধ্য দেবতার

সঙ্গে সারূপ্যমুক্তি লাভ হইয়াছে

সেই “বিদ্যার্থী-সেবক” মহাতপস্বী

চিরকুমার শ্রীরমেশচন্দ্র

স্মরণে

এই পুরুষোত্তম যোগযুক্ত গীতাধ্যান পঞ্চম খণ্ড

উৎসর্গ করিলাম ।

সেই পূতজীবনের পবিত্রতার স্পর্শ পাব

এই প্রত্যাশায়—

কৃপাধন—মহানামব্রত

সূচীপত্র

5/683

বিষয়

পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রাসঙ্গিকতা	...	১
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকরণ	...	৬
জ্ঞানঃ জ্ঞেয়ঞ্চ	...	১১
প্রকৃতি পুরুষ প্রকরণ	...	১৫
মার্গ-ভেদ	...	১২

চতুর্দশ অধ্যায়

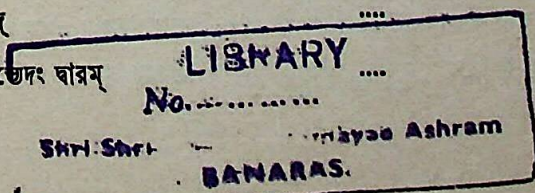
ত্রিগুণের কথা	...	২৪
ত্রিগুণ ও গুণাতীত ভক্তিব্যোগ	...	২০

পঞ্চদশ অধ্যায়

গুহ্যতম শাস্ত্র	...	৩৮
অশ্বখং প্রাহরব্যায়ম্	...	৪৬
তদ্ধাম পরমং মম	...	৫১
মমৈবাংশো জীবনোকে	...	৬১
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে	...	৬২
উত্তমঃ পুরুষস্ত অন্তঃ	...	৭৪

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবী সম্পদ	...	৮৪
আস্থরী সম্পদ	...	৮২
ত্রিবিধং নরকভেদং দ্বারম্	...	২৪



প্রকাশকের নিবেদন

গীতাধ্যান পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইল। পরবর্তী খণ্ডে এই মহাগ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাহা প্রকাশ করিবার বাসনা আমাদের অন্তরে রহিয়াছে।

গীতাধ্যান সাধু, সন্ত এবং স্বধীজন কর্তৃক আদৃত ও প্রশংসিত হইয়াছে। ইহা লেখক এবং প্রকাশকের আনন্দের বিষয় নিশ্চয়ই।

গীতাধ্যান সমাপ্তির পূর্বে প্রকাশক হিসাবে আমার একটি বিশেষ বক্তব্য আছে। পাঠকবৃন্দ আমার সেই নিবেদনটি অবহিতচিত্তে ভাবিয়া দেখিবেন ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

গীতা সমস্ত উপনিষদের সার—নিখিল শাস্ত্রের মূল। গীতা শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিহত বাণী, কাজেই ইহা যে অমৃতময় হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। গীতা স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রন্থ, যদিও ইহা মহাভারতের অংশ। গীতা গ্রন্থের অত্র নিরপেক্ষ একটি নিজস্ব রূপ আছে নিশ্চয়ই। গীতার পঠন পাঠনে, সেই রূপটিই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, — ব্যক্তিগত মতবাদ বা সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তানুযায়ী গীতার ব্যাখ্যা করিতে গেলে গীতার সেই আসল স্বরূপটি, অন্তর্নিহিত সত্যটি রূপায়িত না হইবারই সম্ভাবনা।

গীতাধ্যানে গীতার মূল স্বরূপটি কি তাহাই ধ্যানযোগে দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কোন সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বা নিজস্বমতবাদ ইহাতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয় নাই। গীতাপাঠক গীতার বক্তব্যই জানিতে চাহেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদ কিংবা ব্যক্তিবিশেষের মতবাদ জানিবার জ্ঞান নিশ্চয়ই কেহ গীতালোচনায় প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু বাজারে যে সকল ছোট বড় গীতার সংস্করণ রহিয়াছে, তাহার

অধিকাংশই সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যাত, কাজেই সেই সকল গ্রন্থপাঠে গীতার আসল বক্তব্যটি কি তাহা ধরা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু গীতাধ্যানে গীতার মূল বক্তব্যটিই অগ্রমত বা পথ-নিরপেক্ষ-ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা গীতাধ্যানের বিশেষত্ব। গীতা ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁহার ব্যাখ্যা সুপরিষ্কৃত করার জন্য বহুস্থানে গীতার বাক্য উদ্ধৃত করিয়াই তাহা করিয়াছেন, তাহাতে গীতার মূল বক্তব্যটি যেরূপ রূপায়িত হইয়াছে, অতরূপ করিলে তাহা হইত না বলিয়াই আমরা মনে করি। একটা কথা আছে, Internal evidence এবং সেটাই যে বক্তব্য-বিষয়ের সেরা প্রমাণ—তাহা সর্বজন-স্বীকৃত। এক্ষেত্রে ব্রহ্মচারীজী মহারাজ গীতার আভ্যন্তরিক প্রমাণের উপরই তাঁহার বক্তব্য দাঁড় করাইয়াছেন। তাই তাঁহার ব্যাখ্যায় পূর্বাপর এমন সামঞ্জস্য দেখিতে পাই, যাহাতে গীতাধ্যান পাঠের পর পাঠককে আর বলিতে হয় না—গীতার অমুক স্থানটির অর্থ পরিষ্কার হইল না। আমরা এমন কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি, পাঠক মনোযোগ সহকারে গীতাধ্যান পাঠ করিলে শ্রীভগবানের বাণী, গীতার মূল বক্তব্য বুঝিতে পারিবেন—কথাটি অত্যাশ্চর্য্য কি না, পাঠক গীতাধ্যান পাঠ করিবার পর এ বিষয়ে তাঁহাদের রায় দিবেন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

বক্তব্য-শেষে শ্রীভগবানের বাণী—“গীতা মে হৃদয়ং পার্থ” এই বাক্যটি গীতাপাঠকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া গীতাপাঠে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি। ইতি—

বিনীত

প্রকাশক

LIBRARY

No.

Shri Sri Sri Anandamayee Ashram

ভূমিকা

গীতা কি বৈরাগ্য-বিরোধী ?

খৃষ্টাব্দ ১৯৩৫ এর কথা। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ছাত্র। ছাত্র ছিলাম চারি বৎসর। দায়ে ঠেকিয়া ছাত্র হই। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ইমিগ্রেশন বিভাগের নির্দেশ ছিল, সে দেশে আমার মাত্র তিন মাস বাসের। ছিলাম কিন্তু পাঁচ বছর আট মাস। ছাত্র হইয়াছিলাম বলিয়াই থাকিতে পারিয়াছিলাম।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পত্রিকা আছে। পত্রিকাটির নাম ম্যারুণ (Maroon)। ম্যারুণ একটা বর্ণের নাম। ঈষৎ পিঙ্গল লোহিত (Brownish crimson) বর্ণকে ম্যারুণ বলে। ঐ বর্ণ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ পত্রিকায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে “একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেটের জন্ত গবেষণা করিবার উদ্দেশ্যে ছাত্র হইয়াছে। সকলেই যেন তাহার সহিত সম্মানজনক ব্যবহার করে।”

ঐরূপ লিখিয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। আমি সর্বদা খদ্দের কাপড় চাদর ব্যবহার করিতাম। উহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই হেতু পাছে কেহ ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এই জন্ত ঐ পত্রিকা জানাইয়া দিয়াছিল যে, উক্ত সন্ন্যাসী-ছাত্র সর্বদাই তাহার জাতীয় পোষাক (national costume) ব্যবহার করে।

একদিন একজন অধ্যাপক ক্লাসে আমাকে বলেন—আপনি যখন ক্লাসে আসেন তখন যদি আমাদের ভদ্র পোষাক (civilian dress)

পরিধান করিয়া আসেন, তাহা হইলে কি কোন ক্ষতি হয়? ঐরূপ করিলে সকলের আকর্ষণের বিষয় না হইয়া পাবেন।”

আমি বিনীতভাবে বলিলাম, ‘স্বয়ং, এই খন্দর তো আমার এক ক্ষণের জন্ত ও ত্যাগ করিবার উপায় নাই। ইহা যে আমার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক (Symbol of Protest against British Imperialism in India), আমার উত্তরে অধ্যাপক মহাশয় ও ছাত্রগণ স্তব্ধ হইয়া গেলেন। আমার পরিহিত পোষাকেরও যে একটা গভীর তাৎপর্য আছে— ইহা কেহ ভাবে নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি প্রথমে ছাত্র হই ধর্মীয় বিভাগে (Divinity department)। এই বিভাগে পড়িয়া ছাত্রেরা বি, ডি. ও ডি. ডি. ডিগ্রী লইয়া কোন গির্জার পুরোহিত হয় অথবা পাদ্রী মিশনারী হইয়া দেশ বিদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারে যায়। এই বিভাগে বৎসরাধিক কাল পড়িয়া আমি পরে দর্শন বিভাগে (Philosophy department) চলিয়া যাই।

ধর্মীয় বিভাগে পাঠকালে বাইবেল পড়িতে হইত। আর পড়িতে হইত খৃষ্টধর্ম ও খৃষ্টীয় চার্চের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। আর একটি বিষয় ছিল বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা (Comparative Religion)। এই বিষয়টি পড়াইতেন অধ্যাপক হেডেন (Prof. Haydon)। যখন হিন্দুধর্মের বিষয় পড়াইতেন তখন গভীর জ্ঞানের অভাববশতঃ তিনি মাঝে মাঝে আপত্তিকর মন্তব্য করিতেন—যাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকা যায় না। ফলে ক্রাশেই তর্কবিতর্ক হইত। অন্তান্ত ছাত্রেরা উপভোগ করিত।

একদিন অধ্যাপক হেডেন বলিলেন—কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বর মানেন না, তিনি প্রকৃতিবাদী (Naturalist)। আমি আপত্তি

[১২]

তুলিলাম। বাদানুবাদ অনেক হইল। মীমাংসা হইল না—অধ্যাপক তাঁহার মত ভাগ করিলেন না।

অপর একদিন গীতার প্রসঙ্গ করিতে অধ্যাপক হেডেন বলিলেন—
“হিন্দুদের প্রায় সকল ধর্মগ্রন্থ নিবৃত্তিমুখী (otherworldly), একমাত্র গীতা প্রবৃত্তিমুখী (this-worldly)। অধ্যাপক মহাশয় যুক্তিবিজ্ঞাস করিয়া কহিলেন, অর্জুন বৈরাগী হইয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে চাহিলেন। তাঁহার সারথী কৃষ্ণ তাঁহাকে কঠোরভাবে বাধা দিয়া বলিলেন—“উঠ, যুদ্ধ কর, রাজ্য ভোগ কর।” এমন কথা কিন্তু উপনিষদে পাওয়া যাবে না। উপনিষদে কেবল জগৎ মিথ্যা, সব ছাড়। ছাড়িয়া ব্রহ্ম হইয়া যাও। কেবল গীতাই বলিয়াছেন “ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।”

অধ্যাপক মহাশয়ের এই মন্তব্যের পর আমার নীরব থাকার উপায় ছিল না। এতগুলি ছাত্র গীতা সম্বন্ধে এই ধারণা লইয়া যাইবে, ইহা আমার পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন হইয়া উঠিল। আপত্তি তুলিলাম। অনেক বাদানুবাদ চলিল। ক্লাসের ঘণ্টা পড়িয়া গেল। বিষয়টি অমীমাংসিত রহিয়া গেল।

ছাত্রগণের বিপুল আগ্রহ দেখা দিল। সকলেই জানিতে চায় গীতার যথার্থ আদর্শ। বিশেষতঃ ঐ সকল ছাত্রেরা অনেকেই ডক্টরেট উপাধি লইয়া এসিয়ার বিভিন্ন দেশে আসিবেন। এই দেশীয় একখানি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ গীতা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা সকলেরই প্রয়োজন। এই বিষয় লইয়া একটা বিশেষ আলোচনা-সভা বসাইতে হইবে, ছাত্রগণের এই সিদ্ধান্ত হইল।

সভা বসিয়াছে। আলোচনার প্রণালী স্থির হইল—ডিবেটিং ক্লাবের মত। আলোচনার বিষয় হইল—গীতা ভোগবাদী কি ত্যাগবাদী।

গীতা বৈরাগ্যবাদী কি বৈরাগ্য-বিরোধী ? (The aim of the Gita – worldly happiness or otherworldly bliss ?)

একজন বিশিষ্ট ছাত্র পূর্বপক্ষী হইলেন। তিনি ষাণ্মথ যুক্তি দ্বারা পূর্বপক্ষ স্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন—গীতা ভোগবাদী, গীতার লক্ষ্য ইহকালের সুখভোগ। কারণ—

১। গীতা অর্জুনকে রাজ্যভোগের প্রেরণা দিয়া যুদ্ধে লাগাইয়াছেন।

২। অর্জুন চাহিলেন, বৈরাগী হইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন কাটাইবেন। গীতার বক্তা তাঁহাতে রাজী না হইয়া, তাঁহাকে শত্রুবধে নিযুক্ত করিলেন। অতএব গীতা বৈরাগ্য-বিরোধী।

৩। গীতার মধ্যে অনেক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কথা থাকিলেও গীতার গানের ধূয়া (Burden) —“উঠ, যুদ্ধ কর, শত্রু বধ কর।” অতএব গীতা ইহকালবাদী, কর্মবাদী। কর্মের ফলই হইল ভোগ—সুতরাং গীতা ভোগবাদী।

এই পূর্বপক্ষের জবাব দিতে আমাকে আহ্বান করা হইল। উত্তর শুনিবার জ্ঞান সকলের আগ্রহের অবধি ছিল না। বিস্ফারিত-নয়নে উৎকর্ষ হইয়া সকলে অপেক্ষমান ছিল। আমি উত্তর করিতে দাঁড়াইলাম,—

“গীতা ত্যাগমুখী”। ত্যাগই গীতার মুখ্য লক্ষ্য। গীতা বলিয়াছেন, কর্ম কর, ফল-কামনা ত্যাগ কর। গীতা বলিয়াছেন, যাহা কিছু কর না কেন সবই ঈশ্বরে সমর্পণ কর।—এই সকলই ত্যাগের কথা।

গীতা বলিয়াছেন, সকল ধর্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের শরণ লও। ইহাতে যদি তোমার কোন পাপও হয় তবে তাহার দায়িত্ব ভগবানই লইবেন। তিনিই শরণাগত ভক্তের সর্ব পাপ মোচনের দায়িত্ব লইয়াছেন। এই সব পূর্ণ ত্যাগের কথা।

৩। বেদের কর্মকাণ্ড ত্রিগুণবিষয়ক। অর্জুনকে গীতাকার নিঃশ্রেণ্য হইতে বলিয়াছেন। আত্মবান হইতে বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়রাম না হইয়া আত্মরাম হইতে বলিয়াছেন। যিনি আত্মবান, আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মরাম, তিনি কর্মের অতীত, তাঁহার কোন কার্য নাই। সূত্রাং গীতা ত্যাগবাদী।

৪। সকল কামনা ত্যাগ করিয়া যিনি নিষ্পৃহ হন তিনি শান্তি লাভ করেন—গীতার এই উক্তি ভোগবিরোধী। যে জ্ঞানে সকল কর্ম ভস্মসাৎ হইয়া যায়, গীতা অর্জুনকে সেই জ্ঞানী হইতে বলিয়াছেন। জ্ঞানীর লক্ষণে আছে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য, পুত্র, কন্যা, গৃহাদিতে অনাসক্তি, ও আত্মজ্ঞানপরায়ণতা। ইহাতে বোঝা গেল গীতা ভোগবিরোধী।

অশান্ত মনকে শান্ত করিবার উপায় গীতার মতে অভ্যাস ও বৈরাগ্য। সূত্রাং গীতা বৈরাগ্যবাদী। গীতা যে ত্যাগমার্গীয় গ্রন্থ, একথা প্রমাণ করিতে শত শত উদ্ধৃতিও দেওয়া যায়।

পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন—অর্জুন, “ভিক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকাও ভাল,” এইরূপ কথা বলিলে বক্তা শ্রীকৃষ্ণ রাজী না হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধের প্রেরণা দিয়াছেন—এই অল্প গীতা বৈরাগ্য বিরোধী—এই মন্তব্য অসার।

ভিক্ষা করিয়া জীবিকার্জন করাই বৈরাগ্যের লক্ষণ নহে। পথের সকল ভিখারীরা বৈরাগ্যবান্ নহেন। ত্যাগ, বৈরাগ্য কথাগুলির অর্থ আরও স্পষ্টতর হওয়া প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকলের প্রতি আসক্তিশূন্যতাই বৈরাগ্য। ইহা কোন লৌকিক কারণে হইলেও তাহাকে বৈরাগ্য বলিব না। পরমবস্তু যে ঈশ্বর তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতঃ যদি তদভিন্ন বস্তুর প্রতি বিরাগ জন্মে তবে তাহা বৈরাগ্যপদবাচ্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া অর্জুনের কি বৈরাগ্য হইয়াছিল? কখনই নয়। অর্জুনের ব্যাধির যিনি চিকিৎসক তিনি অর্জুনের রোগ নির্ধারণ

করিয়াছেন—ক্লেশ, কষ্ট, ক্ষুদ্রহৃদয়-দৌর্বল্য, অজ্ঞান-সংমোহ। এই রোগেরই তিনি চিকিৎসা করিয়াছেন। স্বস্তি হইয়া রোগী অৰ্জুন বলিয়াছেন—আমার মোহ কাটিয়াছে। স্থিতি ফিরিয়া আসিয়াছে, অস্থিরতা চলিয়া গিয়াছে, সন্দেহ নিরসন হইয়াছে। সুতরাং অৰ্জুনের হইয়াছিল মোহ, স্থিতিবিভ্রম, অস্থিরতা, সংশয়চিন্তিতা। ইহাদের একটিও বৈরাগ্য নহে। অতএব অৰ্জুনের বৈরাগ্য হইয়াছিল, গীতার বক্তা তাহা মনে করেন নাই—এই কথা সর্বৈব মিথ্যা।

গীতার যুদ্ধের প্রেরণা গানের ধ্রুপদের মত পুনঃ পুনঃ শ্রুত হয়, ইহা ঠিক কথা বটে। তবে, গীতায় যুদ্ধ কর অর্থ কর্তব্য কর। ঘটনাক্রমে তখন অৰ্জুনের কর্তব্যই ছিল যুদ্ধ করা। গীতায় কর্তব্য পালনের প্রেরণা আছে একথা ঠিকই। জাগতিক কর্তব্য করিবার প্রেরণা আছে সুতরাং গীতা জগৎমুখী একথা বলা অবশ্যই চলে। গীতা কখনও জগৎ মিথ্যা একথা বলেন নাই। সুতরাং জাগতিক কর্তব্য কর্ষ উপেক্ষা করা গীতার অভিপ্রেত নয়। এই দৃষ্টিতে গীতা কর্ষবাদী, ইহজগৎমুখী, কর্তব্যনিষ্ঠ। জগৎমুখী হইয়া আবার ত্যাগব্রহ্মী বা বৈরাগ্যনিষ্ঠ কি করিয়া হয়—ইহা অপর একটি প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াই বক্তব্য শেষ করিব।

অনেকেই মনে করেন ত্যাগ আর ভোগ বিরোধী। জগৎমুখী হইলে আর ঈশ্বরমুখী হওয়া যাইবে না বা ঈশ্বরমুখী হইলে আর জগৎমুখী হওয়া সম্ভব নয়, এই ধারণা আপনাদের ভুল। গীতার দৃষ্টিতে ইহা মারাত্মক ভুল।

গীতার উপদেশ হইল—ত্যাগী হইয়া ভোগী হও। ত্যাগের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া ভোগ কর। কামনাশূন্য হইয়া কর্ষ কর। যার কামনা আছে সে অনবরত কর্ষ করিলেও গীতার বিচারে কর্ষী নয়। যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইয়া বৈরাগ্যবান হইয়া কর্ষ ও কর্তব্যের উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, কর্ষ করিতে তাঁহারই অধিকার। সে-ই প্রকৃষ্ট কর্ষযোগী। যিনি জ্ঞানী তিনিই শ্রেষ্ঠ

কর্মী। আবার যাঁহার ঈশ্বরে একনিষ্ঠ ভক্তি তিনিই জানী। হৃতরাং ভগবদমুরারী ও বিষয়-বিরাগী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ কর্মী—প্রকৃত কর্মযোগী।

যাহাদের ত্যাগ নাই শুধু নিরেট ভোগী, গীতা তাহাদিগকে অস্বর বলিয়াছেন। তাহাদের সম্পদকে আস্থরিক সম্পদ বলিয়াছেন। যিনি ত্যাগভূমিতে স্থিত থাকিয়া ভোগের মধ্যে বিচরণ করিলেন—তিনি মহামানব। গীতায় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ জ্ঞানের প্রতীক। ধনুর্দ্বার অর্জুন বিরাট কর্মের প্রতীক। উভয়ের মিলনে ত্যাগ ও ভোগের একত্রীকরণে, গীতা এক মহামানবত্বের উজ্জ্বল আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন বিশ্ব জগতের সম্মুখে।

বৈরাগ্য (renunciation) ও কর্মবাদের (action) এই অপূর্ণ সমাধান শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ চমৎকৃত হইলেন। ছাত্রবন্ধুগণ জনে জনে আমার কর্মমর্দন করিয়া কহিলেন,—গীতার উপর অভিনব আলোকপাত করিলেন।

যিনি পূর্বপক্ষ তুলিয়াছিলেন তিনি আমার হাতখানি তাঁর দুই হাতে চাপিয়া নিজ বুকের কাছে নিয়া কহিলেন—How remarkably you have presented the philosophy of the Gita in synthesising otherworldly detachment and worldly attainment. To us, the Westerners, this is a message; unheard of. The Book—Bhagavata Gita, we simply peruse, you certainly pursue it.

“কী চমৎকারভাবে গীতার দার্শনিক ভূমিকাটি আপনি স্থাপন করিলেন। ভোগ আর ত্যাগের মধ্যে যে সামঞ্জস্য হয় ইহা আমাদের কাছে অশ্রুতপূর্ব বার্তা, গীতা গ্রন্থখানা আমরা পড়ি মাত্র, আপনারা জীবনে রূপায়িত করেন।

গ্রন্থকার

5765B

গীতা-প্রাণ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রাসঙ্গিকতা

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নাম ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগ। এই অধ্যায়ে প্রকৃতি পুরুষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সম্বন্ধে আলোচনা। অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুন প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এই ছয়টি বিষয়—প্রকৃতি-পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—জানিবার জন্ম সমগ্র অধ্যায়টি অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরেই সম্পূর্ণ।

প্রশ্নবোধক প্রথম শ্লোকটি কোন কোন গীতা-ব্যাখ্যাকার ধরিয়াছেন, কেহ কেহ বা ধরেন নাই। যাঁহারা শ্লোকটি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা মনে করিয়াছেন, অর্জুনের এই প্রশ্ন এখন না হইলে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর, এই অধ্যায়ের কোন প্রাসঙ্গিকতা দেখান যায় না। যাঁহারা শ্লোকটি গ্রহণ করেন নাই তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিকতা দেখাইবার জন্ম যদি অর্জুনের প্রশ্নের অবতারণা করিতে হয়—তাহা হইলে আবার অর্জুনের প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা দেখাইবার জন্ম অত্যাধিকারিক অবতারণা করিতে হইবে।

বস্তুতঃ অর্জুনের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার মূলে যে যুক্তি দেখান প্রয়োজন, সেই যুক্তি দ্বারাই প্রশ্ন ছাড়াও অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিকতা স্থাপিত হইতে পারে। অর্থাৎ যে কারণে অর্জুন এখন এই প্রশ্ন তুলিতে

পারেন, সেই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ ঐ কথা বলিতে পারেন জিজ্ঞাসিত না হইয়াও। সুতরাং অর্জুনের প্রশ্নজ্ঞাপক প্রথম শ্লোকটি স্বীকার করা হউক আর না হউক, এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা পূর্বাহেই দেখাইতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়ের সূচনায় শ্রীভগবান বলিলেন অর্জুনকে—
তোমাকে এমন কথা বলিব যাহা জানিলে আর জ্ঞাতব্য কিছু বাকী থাকিবে না—‘যজ্ঞাহা নেহ ভূয়োহ্যজ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে’ (৭।২)। ঐ কথা বলিয়াই তিনটি বস্তুর খবর দিয়াছেন। (১) ভূমি, অপ, অনল, বায়ু, থ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই অষ্টধা আমার প্রকৃতি। (২) আর একটি আমার পরা প্রকৃতি সেটি জীবভূতা ... “যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ” (৭।৫)। দ্বিতীয়টির নাম পরা প্রকৃতি বলায় প্রথমটির আমরা অপরা প্রকৃতি নাম রাখিতে পারি। (৩) আমি স্বয়ং। যে আমি নিখিল জগতের প্রভব ও প্রলয়— আদি ও অন্ত। যে আমি অপেক্ষা পরতর আর কিছুই নাই। “মত্তঃ পরতরং নাগ্গং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।” (৭।৭)

তিনটি বস্তু হইল—ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি ও তিনি নিজে। এই তিনটি বস্তুর সমগ্র তত্ত্ব জানিলে আর কিছু জানা বাকী থাকিবে না। জগৎ, জীব ও ঈশ্বর। *World, man and God. Creation, created and creator.* এই তিনকে জানিতে হইবে। জানিতে হইবে ইহাদের সম্বন্ধ, সম্পর্ক, সামঞ্জস্য বা সমন্বয়। তাহা হইলে আর কিছু থাকিবে না অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য।

এই ভূমিকা করিয়া বক্তা প্রথমেই তৃতীয় বস্তুটির কথা অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বটি ধরিলেন। “ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব”—এই হইতে চলিতে লাগিল ঈশ্বরের কথা। সপ্তম অধ্যায় ভরিয়া এই কথাই। কথা শেষ হইতে না হইতে অষ্টমের প্রারম্ভে অর্জুনের কতিপয় জিজ্ঞাসা। তার উত্তরে অষ্টম কাটিল। অকথিত কথা আবার নবমে চলিল। ঈশ্বর-তত্ত্ব, ঈশ্বরকে পাইবার উপায়, ভক্তিতত্ত্ব ও ভজনতত্ত্ব চলিল। দশমের প্রারম্ভেও ঐ প্রসঙ্গ চলিতে চলিতে অর্জুনের জিজ্ঞাসা। “কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি” (১০।১৭) - কি কি ভাবে তোমাকে ভাবিব। উত্তরে দশম অধ্যায় শেষ। একাদশের প্রারম্ভে দর্শন প্রার্থনা ও প্রদর্শন। বর্ণনা স্তবস্তুতি সাস্ত্রনা। দ্বাদশের প্রারম্ভে আবার জিজ্ঞাসা, উত্তরে ভক্তিয়োগের অবতারণা।

সুতরাং সপ্তম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত ঈশ্বরতত্ত্ব ও তৎসম্পর্কিত ভক্তি ও ভজনতত্ত্ব বলা হইয়াছে। অপরা ও পরা প্রকৃতির কথা তুলিবার সুযোগ আর মিলে নাই। তাহা না বলা হইলে সপ্তমের প্রারম্ভে যে কথা শুনাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা পূর্ণ হয় না। অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতির কথা পৃথক্ পৃথক্ বলিতে হইবে। ছুঁয়ের সম্পর্কের কথা বলিতে হইবে। আবার এই ছুঁয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ কি সবই বলিতে হইবে। তবে তো প্রতিজ্ঞা বাক্য রহিবে।

অপরা প্রকৃতি - ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও মন, বুদ্ধি, অহংকার—ইহাই আমাদের দেহ-ক্ষেত্রের উপাদান। ইহারাই

ক্ষেত্র পদবাচ্য। পরা প্রকৃতি যিনি ধরিয়া আছেন তিনিই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা বা ক্ষেত্রজ্ঞ। এই দু'য়ের সম্পর্ক জানার আগ্রহ অর্জুনের এখন জাগা অসম্ভব বা অপ্রাসঙ্গিক কিছু নয়। বরং খুবই স্বাভাবিক। আর অর্জুনের না জাগিলেও, বক্তার সে কথা স্মরণ করিয়া বলা প্রয়োজন।

শুধু প্রকৃতি এই শব্দটি দ্বারা অপরা প্রকৃতিই বুঝায়। যে মূল বস্তু হইতে এই অষ্টধা প্রকৃতির প্রকাশ, তাহাই মূল প্রকৃতি-তত্ত্ব। আর পুরুষ বলিতে উক্ত পরাপ্রকৃতি বা জীবশক্তি বুঝায়—যার ভোগ সাধনের জন্য প্রকৃতির যাবতীয় বিকার। ঐ বিকারগুলিকে আট সংখ্যা দ্বারা বলা হইয়াছে, এখন আবার চব্বিশ সংখ্যা দ্বারাও কহিবেন। যে ভাবে বল না কেন জীবশক্তি বা পুরুষতত্ত্ব তার মূলে। সুতরাং সপ্তম অধ্যায়োক্ত পরা ও অপরা প্রকৃতির কথাই প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব। এখনই তাহা বলিবার উপযুক্ত সময়।

সপ্তম অধ্যায় প্রারম্ভে শ্রীভগবান আর একটি কথা বলিয়াছেন—সবিজ্ঞান জ্ঞানের কথা তোমায় বলিব। জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞেয় বা জ্ঞাতব্য আছে। সুতরাং জ্ঞান কি, জ্ঞেয় কি জানিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ এখন অর্জুনের স্বাভাবিক। আর জিজ্ঞাসিত না হইলেও পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষণের জন্য বক্তার এখন প্রকৃত পুরুষ তত্ত্বটি বলা আবশ্যক।

পুরুষ প্রকৃতির কথা বলিবেন। পুরুষোত্তমের কথা বলিবেন। কিছু বলিয়াছেন, আবার বলিবেন পঞ্চদশে পরা

অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধ ও উভয়ের সঙ্গে পুরুষোত্তমের সম্বন্ধ — এই সব বলিতেই হইবে। না বলিলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। বিশ্বরূপ দর্শনে যে ভাবাকুলতার উদয় হইয়াছিল অর্জুনের মনে, তাহা কাটিয়া গিয়াছে সখাকে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে ভক্তিরোগ শুনিয়া। অর্জুন এখন শূন্য এবং স্বস্থ। অবশিষ্ট কথা বলিবার এখনই প্রকৃষ্ট সময়। ইহাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা।

দুই

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকরণ

দেহ আর দেহী ইহাদেরই অপর এক নাম ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ । দেহ দেহীর প্রসঙ্গ দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে—“দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্ব ভারত”(২।৩০)। এই দেহী সকলের দেহে নিত্য অবধ্য । সকলের দেহেই দেহী আছেন, তিনি নিত্য এবং অবধ্য । দেহ অনিত্য ও বধ্য । এই কথা বলা হইয়াছে । এই নিত্য ও অনিত্য বস্তু কি ভাবে সম্পর্কান্বিত হইয়া আছে—ইহাই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকরণের লক্ষ্য ।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই পরিচয়টির মধ্যেই উভয়ের সম্পর্কের সঙ্কেত বিद्यমান । এই শরীর হইল ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্রের সব খবর যিনি জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ । (১৩।২) । দেহ দেহী শব্দে ধন ধনীর মত স্ব-স্বামিসম্বন্ধ প্রকাশ পায় । ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দ দ্বারা জ্ঞাতা জ্ঞেয় সম্পর্ক ফুট হইল ।

ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

“মনরে, কৃষি কাজ জান না ।

এমন মানব জমি রইল পতিত,

আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥”

শ্রীরামপ্রসাদ যাহাকে মানবজমি বলিয়াছেন—গীতা তাহাকেই ক্ষেত্র বলিয়াছেন । আর এই ক্ষেত্র আবাদ করায়

অধিকার যাঁহার তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। আবাদ করিতে হইলে জমি-
খানির সকল খবর জানা প্রয়োজন। তাই বলিয়াছেন—এই
ক্ষেত্র কি, ইহা কি প্রকার, ইহাতে কি কি বিকার আছে, কি
হইতে কি হয়, কি ইহার প্রভাব সকলই জানা প্রয়োজন।
(১৩।৪) বক্তা এই সকল সংক্ষেপে (সমাসেন) কহিবেন এই
আশ্বাস দিলেন। “তং সমাসেন মে শৃণু।” শ্রবণ কর অর্জুন
সংক্ষেপে বলিতেছি।

এই সকল কথা যাহা বলিব—তাহা কেবল আমার মতবাদ
নহে। বৈদিক যুগ হইতে ঋষিগণ নানা ছন্দে এই সব কথা
গাহিয়াছেন। সাংখ্যসূত্র এই তত্ত্ববস্তুর কথা কহিয়াছেন।
নানা যুক্তি তর্ক দ্বারা ব্রহ্মসূত্র এই তত্ত্বসকল স্থাপন করিয়াছেন।
তঁাহাদেরই বলা-কথা আবার তোমাকে বলিতেছি শোন।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞেয় আর একটি রহস্য বলিলেন যে, সর্বক্ষেত্রে
আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে (১৩।২)। ইহাতে বলা হইল
যে, এই বিশাল বিশ্ব-প্রপঞ্চ একটি ক্ষেত্র। ইহার যিনি জ্ঞাতা
তিনিও ক্ষেত্রজ্ঞ। বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ ও ছোট ক্ষেত্রের
ক্ষেত্রজ্ঞ—ব্রহ্মাণ্ডও ভাণ্ড এই দু'য়ের আবাদকারী মূলতঃ একই।
সমুদয় ক্ষেত্রে আমি ভগবানই ক্ষেত্রজ্ঞ।

ক্ষেত্র একটিই, বহু নয়। তাহার সামগ্রিক ভাবে দখলকারী
শ্রীভগবান। আর ভগবানের অধীন থাকিয়া—অগণিত জীব-
চৈতন্য ক্ষুদ্রক্ষেত্রজ্ঞরূপে ঐ এক বিরাট ক্ষেত্রেই এক এক
অংশ—নিজ নিজ শরীররূপে ভোগ করে। সমুদয় ক্ষেত্র বিরাট

ক্ষেত্রজের শরীর—তার মধ্যে থাকিয়া সসীম জীব সসীম ক্ষেত্রের মালিক হইয়া আছে। ক্ষুদ্র জীবের মাধ্যমে, এই বিশাল ক্ষেত্রের একমাত্র জ্ঞাতা বিরাট ক্ষেত্রজ। সেই ক্ষেত্রজ—আমি—ভগবান্ স্বয়ং।

ইহা হইতে বোঝা গেল যে ক্ষেত্র একটিই—এই বিশ্বসংসার। ইহার ক্ষেত্রজ বা ভোক্তা একজনই—ঈশ্বর। ঈশ্বরের অধীনস্থ (তাহারই পরা প্রকৃতি স্বরূপ) বহু জীব সেই একই বিরাট ক্ষেত্রের অংশবিশেষ ভোগ করে নিজ ক্ষেত্ররূপে। এই দৃষ্টি হইতেই পূর্বে বলিয়াছেন—জীবভূতা ঈশ্বরের শক্তি জগৎ ধারণ করিয়া আছে। “যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ”(৭।৫)।

জীবের কর্মের ভোগ নিষ্পাদনার্থই প্রকৃতির পরিণতি। প্রকৃতির পরিণতি-স্বরূপই এই ক্ষেত্রের অবস্থিতি। এই সব কথার দ্বারা বহু জীব একটি ক্ষেত্র ও মূল একজন ক্ষেত্রজ যে ঈশ্বর—তাহাদের মধ্যে একটি সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া গেল।

এখন ক্ষেত্রের বিবরণী বলিতেছেন। পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম), অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত - এই আট, একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও এক অন্তরেন্দ্রিয় মন) ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গোচর (পঞ্চ তন্মাত্র — শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ) এই আট, এগার ও পাঁচ মিশাইয়া চব্বিশ তত্ত্ব - ইহা লইয়া হইল ক্ষেত্র। এইগুলি হইল ক্ষেত্রের উপাদান। ইহার অতিরিক্ত হইল ক্ষেত্রজ বা পুরুষ। ইহা লইয়া সাংখ্যশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

ক্ষেত্রের অনেক গুণ। তন্মধ্যে কতিপয় উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধৃতি, সংঘাত ও চেতনা প্রথমোক্ত চারিটি মনের গুণ। যে মনের শক্তি সব ধরিয়া আছে তাহার নাম ধৃতি। শারীরিক মানসিক সমস্ত তত্ত্বের সংহতি বা সমুচ্চয় (totality) হইল সংঘাত। প্রাণের ক্রিয়া বা চেষ্টা চাঞ্চল্যের নাম চেতনা (vital energy)। এই চেতনা কিন্তু আত্মচৈতন্য নয়। চেতনা প্রাণের শক্তি। চৈতন্য আত্মার ধর্ম আত্মচৈতন্য অর্থ নিজ সত্ত্বা সম্বন্ধে নিজে জ্ঞানশালী হওয়া। আমি যে আছি, ইহা আমি জানি—এই Self consciousness জীবাত্মার স্বরূপ। এই “আমি” বা আত্মচৈতন্যই এই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অববোধই জ্ঞান। এই জ্ঞানেরই নাম আত্মজ্ঞান, আত্মানাত্মবিবেক—প্রকৃতি-পুরুষজ্ঞান, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ হইলে তার আচরণ শুদ্ধ হয়। সেই ব্যক্তিতে কতকগুলি অপূর্ব গুণের উদয় হয়—“অমানিহম অদস্তিহং” ইত্যাদি। পরবর্তী জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রকরণে সেগুলি আলোচিত হইবে। পূর্ববর্তী (১৩।৪) শ্লোকে যাহা যাহা বলিবে বলিয়াছিলেন—তাহা বলা হইল। ক্ষেত্র যাহা, যেরূপ, যেরূপ বিকারযুক্ত, এবং যাহা হইতে যাহা (যতঃ চ যৎ) আর সেই ক্ষেত্রজ যেরূপ (সঃ চ যঃ) ও যেরূপ প্রভাববিশিষ্ট এইসব বলিবার কথা দিয়াছেন। তাহা বলা হইল।

চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে অব্যক্ত হইতেছেন মূলাপ্রকৃতি। আর একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত হইল বিকৃতি।

পঞ্চতন্মাত্র বুদ্ধি ও অহংকার এই সাত হইল প্রকৃতি-বিকৃতি।
 ক্ষেত্রটি চব্বিশ প্রকার বিকারবিশিষ্ট। আর ক্ষেত্রজ্ঞ অবিকারী।
 বিকারীর সান্নিধ্যে অবিকারীও কখনও কখনও নিজেকে বিকারী
 মনে করে। এইরূপ করিলেই সে বদ্ধ হইয়া পড়ে। আবার
 বিকারী চব্বিশ তত্ত্ব জড়। চৈতন্যময় অবিকারী ক্ষেত্রজ্ঞের
 সন্নিধানে জড়ও নিজেকে চৈতন্যময় বলিয়া অহংকারী হয়। এই
 সকল কথা শেষে পুরুষ-প্রকৃতি প্রকরণে কহিবেন।

— — —

তিন

জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ

জ্ঞান কি, জ্ঞেয় কি, অর্জুন জানিতে চাহিয়াছেন। দুইটি প্রকরণে শ্রীভগবান বিস্তারিতভাবে ভক্তের জিজ্ঞাসার উত্তরটি বলিয়াছেন। আবার বিশদ করিয়া কহিতেছেন। বিশদীকরণে জ্ঞান কি, ঠিক তাহা না বলিয়া, জ্ঞান যাহার হইয়াছে তাঁহার রূপ কি—দেহ মন কার্যাদির ভাব বা অবস্থা কিরূপ তাহাই বলিতেছেন। জ্ঞান বস্তুটি নিরাকার। তাহাকে চিনাইয়া দেওয়া কঠিন। জ্ঞান যাহার হইয়াছে সেই বস্তুটি সাকার। তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেওয়া সহজ। দয়া ভাবটি একটি বালককে বোঝান কঠিন। একজন অন্ধের হাতে কেহ পয়সা দিতেছে এই ছবিটি আঁকিয়া দিলে বালক সহজেই দয়া ভাবটির অনুভূতি লাভ করিতে পারে। শ্রীভগবানও অর্জুনকে জ্ঞান বুঝাইতে তাহাই করিতেছেন। জ্ঞানীর সাকার মূর্তি আঁকিতেছেন।

যিনি জ্ঞানী হইবেন তাঁহার থাকিবে ঈশ্বরে অব্যভিচারিণী ভক্তি। যে ভক্তি কখনও টলে না—এমন অনশ্রাব্য ভক্তি। ভক্তি-সম্পদ যিনি লাভ করেন তিনি হইয়া যান গুণাতীত। গুণময় কোন কিছু তাঁহাকে স্পর্শ করে না। সুতরাং জ্ঞানী হইবেন অহংকারহীন, দম্বহীন, হিংসাহীন, দার্য-পুত্র-গৃহে আসক্তিহীন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয়ে অনুরাগহীন। ইষ্ট

অনিষ্টে তাঁহার সমভাব। সরলতা, ক্ষমা, শৌচ, ধৈর্য্য এই সব তাঁহার অঙ্গের ভূষণ। তিনি নির্জনতা ভালবাসেন। যেখানে বহু লোকের সংঘট্ট সেখানে তিনি যান না। নীরবে একাকী বা হুই চারিটি সজ্জন সঙ্গে মানুষের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখের হেতু ও নিরাকারণের উপায় বিচার করেন। সর্বদা গুরুসেবা—গুরু-আজ্ঞাপালনে রত থাকেন এবং আত্মা পরমাত্মার তত্ত্বানুধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। এই সব গুণ যেখানে দেখিবে, বুঝিবে সেখানে জ্ঞানের আলো জ্বলিয়াছে। যেখানে না দেখিবে বুঝিবে সেখানে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ভরা।

জ্ঞান যাহার হইয়াছে তাঁহার বহিঃপ্রকাশ বা বাহিরের লক্ষণগুলি বলিয়াছেন। এখন তাঁহার ভিতরের দিক বলিবেন। কোন এক বিশিষ্ট জ্ঞেয় বস্তুকে জানাই হইল জ্ঞান। সেই জ্ঞেয় বস্তুর কথাই বলিব (জ্ঞেয়ং যৎ তং প্রবক্ষ্যামি)। এই জ্ঞেয় বস্তুর পরম তত্ত্ব জানিলে অমৃতময় হইয়া যাইবে। (১৩।১২)

এই জ্ঞেয় বস্তুটি হইতেছেন পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম কে, তাঁহার স্বরূপ কি, তাহাই বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম আমারই এক পরম সত্তা (মৎপর), তাঁহার আদি নাই (অনাদি); আদি নাই বলিয়া অন্ত-মধ্যও নাই। লৌকিক ভাষায় যে অর্থে আমার আছে বা নাই কথা প্রয়োগ করি তাহার কোন শব্দই, সৎ বা অসৎ, তাঁহার সম্বন্ধে ব্যবহার হইতে পারে না। ঘট পট যেরূপ আছে বা নাই, ব্রহ্ম বস্তুর থাকা না-থাকা তেমন নয়। “ন সৎ তন্মাস-দুচ্যতে” (১৩।১২)। তিনি সর্বময়। সর্বদিকে তাঁহার হস্তপদ, চক্ষু, কর্ণ। সর্বদিকে তাঁহার শির বদন। আছেন তিনি জগৎ

জুড়িয়া। প্রাকৃত জীব আমাদের মত তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই। কিন্তু, অপ্রাকৃত স্বরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, তাঁহার হাত নাই কিন্তু গ্রহণ করেন, পা নাই কিন্তু বেগে চলেন, চক্ষু নাই কিন্তু দর্শন করেন, কণ্ঠ নাই কিন্তু শ্রবণ করেন। এ স্থলে নাই বলিতে প্রাকৃত হস্ত পদ চক্ষু কণ্ঠ নাই - ইহাই বুঝিতে হইবে। ধরা, চলা, দেখা, শোনা কার্যগুলি যখন আছে তখন ইন্দ্রিয় আছেই। অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়। বাহার নাশ নাই, বিকার নাই, এমন অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় আছে। অপানি' শ্রুতির অ-কার্য নিবেদ্যার্থক নয়, অপ্রাকৃতবোধক। অচক্ষু অর্থ চক্ষু নাই এমন নয়। অচক্ষু অর্থ অপ্রাকৃত চক্ষুবিশিষ্ট। এখানে সর্বৈন্দ্রিয় বিবর্জিত অর্থ—প্রকৃতির বিকারজাত ইন্দ্রিয়রহিত, অপ্রাকৃত চিন্ময় ইন্দ্রিয়শালী।

ব্রহ্ম-পুরুষের কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক নাই (অসক্তং) তবু কিন্তু সকলকে ধরিয়া আছেন (সর্বভূং)। তিনি গুণরহিত কিন্তু গুণের ভোক্তা। তিনি অপ্রাকৃত হইয়াও প্রকৃতির আশ্রয়দক। তিনি জীবগণের অন্তরে আছেন আত্মরূপে, বাহিরে আছেন জগৎরূপে (বহিরন্তশ্চ ভূতানাম)। স্থাবরও তিনি, জঙ্গমও তিনি অতীব সূক্ষ্ম বলিয়া অবিদ্রোহ।

তিনি নিরংশ, অখণ্ড, অবিভক্ত। মনে হয় তিনি বহু সত্তায় বিভক্ত। কিন্তু বিভক্ত থাকিয়াও তিনি অবিভক্ত। সর্বরূপে তিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্তা। তিনি উৎপত্তিশীল (প্রভবিস্থ) পালনশীল (ভূতভর্তৃ) তিনি সংহারক (প্রসিস্থ)।

তিনি সত্ত্ব রজঃ তমোময় প্রকৃতির অন্ধকারের পরপারে ।
তিনি নিখিল জ্যোতির জ্যোতি শুদ্ধসত্ত্বময় । সকলের হৃদয়ে
তিনি চির বিরাজমান । তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই
জ্ঞানগম্য ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞান-জ্ঞেয়ের কথা তোমাকে এই সংক্ষেপে
বলা হইল । আমার যারা ভক্ত তারা এই তত্ত্বগুলিকে ভাল করিয়া
জানে, জানিতে চেষ্টা করে । জানিতে পারিলেই আমার ভাবেতে
ভাবিত হয়, আমাকে আশ্বাদন করিবার যোগ্যতা লাভ করে ।
আংশিক জানা জানা নয় । পূর্ণরূপে জানাই জানা । কোন কিছু
পূর্ণরূপে জানিলেই তার প্রতি আকর্ষণ হয় । প্রীতি জন্মিলেই
পূর্ণরূপে জানা সম্ভব হয় । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রী, জ্ঞান-জ্ঞেয় এইরূপ
সর্ব্বতোভাবে আমাকে জানাই হইল পূর্ণাবয়বে আমার বিষয়
অবগত হওয়া । পূর্ণরূপে জানিলেই আমাতে সহজ প্রীতির উদয়
হয় । প্রীতির উদয় হইলেই সাধক আমাব ভাবে বিভাবিত হয়
আমাকে ভাবিতে ভাবিতে আমার ভাব পায়—আমার স্বধর্ম্ম পায়
“মন্তাবায়োপপত্ততে”(১৩। ৯) ।

— — —

চার

প্রকৃতি পুরুষ প্রকরণ

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে চারটি প্রকরণ। প্রথম হইতে আট শ্লোক ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ প্রকরণ। নয় হইতে উনিশ পর্য্যন্ত জ্ঞান-জ্ঞেয়ের কথা। বিশ হইতে সাতাশ পর্য্যন্ত প্রকৃতি পুরুষ, প্রকরণ। আটাদশ হইতে অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত মার্গভেদ ও ভেদ-অভেদ দর্শন।

সাংখ্যদর্শন অনুযায়ী প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব বলিতেছেন। সাংখ্যদর্শনের এই তত্ত্ব সকলেই মানিয়া নিয়াছেন। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতিই গীতায় পরা ও অপরা প্রকৃতি, অনাদি পরব্রহ্ম হইতে ইহাদের প্রকাশ। সুতরাং ইহারাও অনাদি। সাংখ্যের মতে ইহাদের অনাদিত্ব স্বতঃ। গীতার মতে ইহাদের অনাদিত্ব পরতঃ। অনাদি পরব্রহ্মের দুই প্রকৃতি বলিয়া ইহাদের অনাদিত্ব। সাংখ্যদর্শন পুরুষ প্রকৃতি মানিয়া দ্বৈতবাদী হইয়াছেন। গীতা পরাপ্রকৃতি ও অপরাপ্রকৃতি—একই পরব্রহ্মের দুই প্রকৃতি মানায়—অদ্বৈতবাদীই রহিয়াছেন। গীতা নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদি নহে, সর্বিশেষ অদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সঙ্গেই গীতার ঘনিষ্ঠতা। প্রকৃতির কি কার্য্য ও পুরুষের কি কার্য্য তাহা পৃথক করিয়া বলিতেছেন। সকল গুণ ও বিকার প্রকৃতি হইতে জাত। গুণ বলিতে তিন গুণ ও বিকার বলিতে চতুर्वিংশতি তত্ত্ব। কার্য্য ও করণের কর্ত্তব্যও প্রকৃতির।

কার্য্য বলিতে শরীর ও করণ বলিতে ইন্দ্রিয়গণ। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের জন্মদাত্রীও প্রকৃতি (প্রকৃতিসম্ভবান্)। তাহাদের কর্ত্রীও প্রকৃতি।

পুরুষ কেবল সুখ ও দুঃখের ভোক্তা। ভোজ্যবস্তু তৈয়ারী করেন প্রকৃতি, ভোগ করেন পুরুষ। প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হইলেই (প্রকৃতিস্থো হি) প্রকৃতিজ গুণের ভোক্তা হন। পুরুষ গুণাতীত কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গ ও সান্নিধ্য বশতঃ সে গুণময় হইয়া সুখভোগী ও দুঃখভোগী হয়।

পুরুষ যে নানা যোনিতে জন্মে তাহার কারণও প্রকৃতিজ গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ। সত্ত্বগুণাধিক্য হইলে পুরুষ জন্মে দেবতা বা ঋষি হইয়া। রজোগুণের অধিক্য মানব হয়। তমোগুণের প্রবলতায় পশুজন্ম হয়। সুতরাং পুরুষের জন্ম-মৃত্যু দুয়ের কারণই প্রকৃতি। প্রকৃতির সঙ্গ ছাড়িতে পারিলেই সে জন্ম-মৃত্যুর উদ্ধে উঠিতে পারে।

পুরুষ প্রকৃতিতে আরোহণ করে, তাহাতে প্রকৃতির সকল গুণদোষ তাহাতে বর্ত্তে। যেমন একজন মানুষ কোন গাড়ীতে আরোহণ করিলে সেই গাড়ীর গতি সে প্রাপ্ত হয়, গাড়ী যে বেগে তখন যায়, আরোহীও তখন সেই বেগে চলে। প্রকৃতির গাড়ি হইতে অবতরণ না করিলে সে পুরুষ আর নিজের গতি বা স্বরূপ লাভ করিতে পারে না। প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে তার আর জন্ম কর্মের বন্ধন হইতে অব্যাহতি নাই।

নিস্তার লাভের উপায় কি তাহা বলিতেছেন। পুরুষকে প্রকৃতি হইতে পৃথক করিয়া জানিতে হইবে। পৃথক করার কৌশল আছে। আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে জানিতে হইবে। পরমাত্মা কোথায় আছেন? এই দেহেই (দেহেহস্মিন্)। দেহে যেমন দেহী বা আত্মা আছেন, সেইরূপ প্রতিদেহে আত্মার আত্মা পরমাত্মা আছেন। তিনি নিখিল বিশ্বের ক্ষেত্রজ্ঞ। যিনি নিখিল বিশ্বের বিশ্বাত্মা তিনিই আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান (১৮।১১)। এই পরমাত্মাকে জানিতে হইবে, তবেই জীবের নিস্তার লাভ।

জীবের মধ্যে জীবাত্মা তো আছেই, তাহা ছাড়া পরমাত্মাও আছেন। এই দেহরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইটি পাখীই আছেন (দ্বা সুপর্ণা)। জীবের আত্মার নামই পুরুষ। পরমাত্মার নাম 'পুরুষঃ পরঃ', পরম পুরুষ। তিনি নিকটে থাকিয়া সব দেখেন তাই উপদ্রষ্টা। তিনি অনুমোদন করেন তাই অনুমন্তা। তিনি জড় যে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি তাহাদিগকে চৈতন্য দ্বারা ভরণ করেন তাই ভর্তা। তিনি অচৈতন্য বস্তুকে চৈতন্যবিশিষ্টের মত করেন। তিনি নিজে নির্বিষকার হইয়াও জীবের সুখ দুঃখ উপলব্ধি করেন—আমাদের ব্যথা-বেদনা বুঝেন তাই তিনি ভোক্তা। জীবাত্মাগণের ঈশ্বর বলিয়া তিনি মহেশ্বর।

এই পরম পুরুষ পরমাত্মা সব জীবহৃদয়ে সতত বিद्यমান। ইনি নারায়ণ। “জীবহৃদিজলে বৈসে সেই নারায়ণ।” এই নারায়ণকে জানিলে বন্ধনমুক্তি। একদিকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন,

বুদ্ধি ইহারা প্রকৃতির বিকারজ । অপর দিকে নারায়ণ । জীবাত্মা
 মধ্যস্থলে । এই জন্ত বৈষ্ণবশাস্ত্রে জীবাত্মাকে তটস্থ শক্তি
 বলা হইয়াছে । জীবাত্মা প্রকৃতিমুখী হইলে তার বন্ধন ।
 নারায়ণমুখী হইলে মুক্তি । কিরূপে জীব নারায়ণমুখী হইতে
 পারে তাহা পরবর্ত্তী প্রকরণে বলিতেছেন ।

পাঁচ মার্গভেদ

পৃথগ্ ভাবম একস্মম্

নারায়ণকে জানিবার চারিটি বিভিন্ন পথের কথা বলিতেছেন ।
(১) ধ্যানের দ্বারা, (২) সাংখ্য (জ্ঞান) যোগের দ্বারা, (৩) কৰ্ম-
যোগের দ্বারা, (৪) উপাসনা দ্বারা, (১০।২৫-২৬) । এই সকল
যোগের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ আবার বলিতেছেন ।
গীতা এই সকলগুলি মার্গের সমন্বয় করিয়াছেন ।

১ । ধ্যানের কথা পূর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারে কহিয়াছেন ।
বলিয়াছেন, যোগী অর্থাৎ ধ্যানযোগী একাকী নির্জন স্থানে
(রহসি স্থিতঃ) সংযতচিত্ত, সংযতদেহ ও কামনাশূন্য হইয়া
বসিবে । পবিত্র স্থানে আসনে বসিবে । চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া
সংযত করিবে (যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ) । সরল নিশ্চল ভাবে
বসিবে । নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিবে । ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিবে
(ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ) । মৎপরায়ণ হইয়া (মৎপরঃ)
“যুক্ত আসীত” সমাধিস্থ হইবে । এই সব কথা ষষ্ঠ অধ্যায়
একাদশ হইতে পঁচিশ শ্লোক পর্য্যন্ত বিস্তারে কহিয়াছেন । এই
ধ্যানযোগকে “আত্মসংস্থঃ” ধ্যানযোগ বলা যায় । ইহার শেষ
কথা ‘আত্মসংস্থঃ মনঃ কৃতা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ’ মনকে আত্মাতে

স্থাপন করিবে। আর কিছু চিন্তা করিবে না। বষ্ঠ অধ্যায়ে আত্ম সংস্থ ও ত্রয়োদশে “ধ্যানেনাঅনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাঅনাম্”—
আত্মাতে আত্মাদ্বারা আত্মাকে দেখেন—একই কথা।

২। সাংখ্যযোগপথে নারায়ণ দর্শন পাওয়া যায়। গীতায় প্রায় সর্বত্র সাংখ্যযোগ অর্থই জ্ঞানযোগ। “নহি সাংখ্যাং পরং জ্ঞানং।” সাংখ্য অর্থই জ্ঞান। কপিলমুনিকৃত সাংখ্যদর্শন ও সাংখ্যযোগ এক নহে। এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে পুরুষ প্রকৃতির তত্ত্ব বলা হইয়াছে এই সব সাংখ্যদর্শনের কথাই বটে। এই শ্লোকে সাংখ্যযোগ দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় কথার অর্থ জ্ঞানমার্গে তাঁহাকে পাওয়া যায়। জ্ঞানমার্গের পথ হইল বিচার। আত্মা, অনাত্মার বিচার। নেতি নেতি করিয়া বিচার। দেহ আত্মা নয়, মন আত্মা নয়। ইন্দ্রিয়গণ আত্মা নয়, বুদ্ধি মন চেতনা আত্মা নয়। এইরূপে যাহা যাহা আত্মা নয় অর্থাৎ অনাত্মা, তাহা বাদ গেলে আত্মদর্শন ঘটে। ইহা জ্ঞানযোগের পথ।

৩। কর্মযোগের পথ। ফলকামনাশূন্য হইয়া ভগবানে কর্মফলার্পণ করিয়া সংসারের সকল কর্তব্য পালন করা। এই কথা গীতায় শতবার বলা হইয়াছে।

৪। উপাসনা দ্বারা। উপাসনার কথাই ভক্তিয়োগের কথা। অত্যাশ্রয় সকল পথ অপেক্ষা ইহা সহজ। চিত্ত স্থির না হইলে ধ্যানযোগ হয় না। গভীর তত্ত্বজ্ঞ না হইলে জ্ঞানযোগ হয় না। কর্ম করিয়া ফল কামনা না করা ও কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হওয়া অতীব কঠিন কার্য। কতিপয় লোকের পক্ষে ইহা

সম্ভবপর। উপাসনার পথ সকলের পক্ষেই সহজ। কি করিতে হইবে? ‘শ্রুতিপরায়ণাঃ’ হইয়া উপাসনা করিতে হইবে। যাঁহারা দ্রষ্টা সেই আচার্য্যদের মুখে ঈশ্বরের সংবাদ শ্রবণ করিয়া নিবিড়ভাবে বিশ্বাস করিয়া আকুলভাবে তাঁহাকে ডাকাই উপাসনা।

অন্তের নিকট গুনিয়া (শ্রদ্ধাশ্রোভ্যঃ) উপাসনা করা অর্থ হইল যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া। যাঁহার নিকট হইতে গুনিতে হইবে তিনি সত্যদর্শী হইবেন। বহুত্বের মধ্যে একত্বের দ্রষ্টা হইবেন। বহুভেদের মধ্যে যে এক অভেদ তত্ত্ব আছে তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবেন সেই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির উন্নত অবস্থাটি বর্ণনা করিতেছেন।

সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন (সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তঃ পরমেশ্বরঃ)। সমভাবে আছেন, ইহা তিনি দেখেন এবং সকল নাশশীল বস্তুর মধ্যে নাশহীন, অবিনাশী রূপে তিনি আছেন। নিখিল জগতের সকল নাশ হইলেও ঈশ্বর অবিকৃতই রহিবেন। এইভাবে যিনি সকল দেখেন তিনি যথার্থদর্শী। “যঃ পশুতি স পশুতি”। তাঁহার কাছে গুনিবে ঈশ্বর তত্ত্ব।

ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে আছেন। তাঁহার দৃষ্টিও সর্বজীবে সমান (সমবস্থিতঃ ঈশ্বরঃ) ইহা যিনি সত্যিকার জানেন, তিনি কখনও পারেন না কোন জীবকে আঘাত দিতে। যাঁর আত্ম-পর ভেদ নাই, তিনি কোন প্রাণীকে হিংসা করিতে পারেন না। (ন হিনস্তি আত্মনা আত্মনং)।

সকল কৰ্মই প্রকৃতি করে। জীব অকর্তা। এই জ্ঞান
যাঁহার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে তিনিই তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বদ্রষ্টা (স-
পশ্চাতি)। ঈশ্বরতত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞের মুখেই শুনিতে হইবে।

জগতে বহুত্ব আছে। নানাত্ব আছে। ইহাই বিশ্বের বৈচিত্র্য।
অজ্ঞজন বহুকে বহু বলিয়াই জানে ও দেখে। তিনিই প্রকৃত
তত্ত্ববেত্তা, যিনি এই বহুত্বের মধ্যে একত্ব দেখেন। যিনি ভূত-
সংজ্ঞের পৃথক পৃথক ভাব সব একত্ব দেখেন, এক ঈশ্বর বস্তুতেই
বিরাজিত দেখেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ।

যাহাদের জড়দৃষ্টি তাহারা বলে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বহু বস্তুই
সত্য। যাঁহাদের জ্ঞানদৃষ্টি তাঁহারা বলেন, বহু বস্তু মিথ্যা।
এক বস্তুই সত্য। যাঁহাদের ভক্তিদৃষ্টি তাঁহারা বলেন, বহুত্ব
সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে। বহু বস্তু হইতেছে এক বস্তুর
বিস্তার। এক সত্য বস্তু বহুরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এক তত্ত্ব-
অসংখ্য বস্তুর মধ্যে বিকশিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব যিনি জানেন
তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করেন (ব্রহ্ম সম্পদ্বতে তদা)।

এই পরম অনুভবের ভূমিই সর্বোচ্চ ভূমি, যে ভূমিতে
বহুত্বের দর্শন হয় একত্বের বিস্তাররূপে। এই ভূমিতে সকলকেই
পৌঁছিতে হইবে। যিনি পৌঁছিয়াছেন তিনি অন্তকেও পথের
নির্দেশ দিতে পারেন।

“যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।” গুরু-নির্দিষ্ট পথে
উপাসনা করিতে হইবে। পরমাত্মা কি ভাবে নিখিল জীবের
অন্তরে আছেন তাহা আরও একটু স্পষ্ট করিতেছেন। পরমাত্মা
আছেন সকল জীবহৃদয়ে কিন্তু জীবের কৰ্মফলাদির সঙ্গে লিপ্ত

নহেন। আকাশ যেমন সর্ববস্তুতে আছে কিন্তু নির্লিপ্ত, সেইরূপ জীবের ভালমন্দ পরমাত্মায় বর্ত্তে না। বেদ বলিয়াছেন, জীবাত্মা পাখী কর্মফল খান। আর পরমাত্মা পাখী খায় না, কেবল তাকাইয়া দেখেন।

শুধু তাকাইয়া দেখেন না, আরও একটি কার্য করেন। তিনি সূর্যের মত আলো দিয়া নিখিল ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন, পৃথিবীর মালিণ্য যেমন সূর্যে লাগে না, জীবের দোষগুণ সেইরূপ পরমাত্মায় স্পর্শে না। পরমাত্মা নিখিল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রী। ক্ষুদ্র জীব তাহার ক্ষুদ্র শরীররূপ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রী। পরমাত্মার কৃপায় জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে (জ্ঞানচক্ষুশা), ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের যে ভেদ তাহার প্রকৃষ্ট জ্ঞান হয়। এই ভেদ যে যথার্থ জানে, সে ভূতপ্রকৃতি হইতে মোক্ষলাভ করে (ভূত প্রকৃতি-মোক্ষ) মুক্ত হইয়া আবার সে সেই পরম বস্তুতেই পৌঁছিয়া যায় (যাস্তি তে পরং)।

ছয়

চতুর্দশ অধ্যায়

ত্রিগুণের কথা

চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণত্রয় বিভাগযোগ। মুখবন্ধে বক্তা বক্তব্য বিষয়ের সূচনা করিলেন। বলিলেন—অর্জুন, তোমাকে বলিব পরম উত্তম জ্ঞানের কথা। যে জ্ঞান পাইয়া মূনিরা সিদ্ধ হইয়াছেন এবং চরমে দেহবন্ধ মুক্ত হইয়া আমার স্বধর্মতা (মম সাধর্ম্য) লাভ করিয়াছেন। জন্ম-জরা-মৃত্যুর অতীত হইয়াছেন।

এই পরম জ্ঞানের কথা শ্রীভগবান সপ্তম অধ্যায় হইতে বলিতেছেন। এখন যাহা বলিলেন তাহা কিছু নূতন কথা নয়। পূর্বের আরও কথার বিশেষ বিবরণ মাত্র। তাই বলিয়াছেন “ভূয়ঃ”। পুনরায় বলিতেছি। পুনরায় বলার প্রয়োজন কি? পূর্বে মাত্র নির্দেশ করিয়াছেন এখন বিশ্লেষণ করিবেন।

পূর্বে কোথায় নির্দেশ দিয়াছেন? কয়েকটি স্থান দেখান যাইতেছে। প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পুরুষ প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করে।

“পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্” (১৩।২।১)
এই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির গুণ কি কি তাহাদের স্বভাব কিরূপ তাহা বলা হয় নাই। গুণ-সংসর্গেই পুরুষের সং অসং যোনিতে জন্মের কারণ হয় (কারণং গুণসঙ্গোহস্ত ১৩।২।১) বলা হইয়াছে, কিন্তু গুণের বিশদালোচনা হয় নাই।

প্রকৃতির গুণের কথা আরও পূর্বে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়েও উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু বিশেষ আলোচনা করেন নাই। প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা কর্মসকল সম্পন্ন হয় (প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি — ৩।২৭)। অহংকারী মূঢ় ব্যক্তি ভাবে, আমি কর্তা। আমি কর্তা বলিয়া অহংকার করে না তাঁহারাই, যাঁহারা তত্ত্ববিৎ। তত্ত্ববিৎ কে? গুণের ও কর্মের বিভাগসমূহ যিনি জানেন। (তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ— ৩।২৮)।

তত্ত্ববেত্তারা আর কি জানেন? তাঁহারা জানেন যে, “গুণা গুণেষু বর্তন্তু” (৩।২৮)। গুণ-সকল পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। তাঁহাড়া সমাজের বর্ণভেদও গুণ-কর্মের বিভাগানুসারে। “গুণকর্মবিভাগশঃ” (৪।১৩)।

গুণ এবং তাহার বিভাগগুলির সম্বন্ধে অনেকবার উল্লেখ করা হইয়াছে, নানা প্রসঙ্গে। ইহাদের বিশেষভাবে বিস্তারিত একান্তই প্রয়োজন। এই জন্ত পূর্বে সংক্ষেপতঃ উল্লিখিত কথা আবার (ভূয়ঃ) বিস্তার করিতেছেন।

এই জ্ঞান লাভ করিলে জীব আমার স্বধর্মতা লাভ করে— “মম সাধর্ম্যমাগতাঃ” (১৪।২) এই কথাটি বিশেষ মূল্যবান।

সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইতে সাধক যে কত বড় হইতে পারে — চরম সাধ্য লাভ হইলে সে কোন্ ভূমিকায় পৌঁছে, গীতা এ সম্বন্ধে নানা স্থানে নানা ভাবে নানা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই উক্তিটি সর্বাধিক সুস্পষ্ট।

চরম প্রাপ্তিকে গীতা ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্মভূত হওয়া, ব্রহ্মনির্বাণ

পাওয়া, স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া, যোগ-সংসিদ্ধি লাভ করা, পরম স্থান পাওয়া, বামুদেবসর্ব্বং—বামুদেবময় হওয়া ইত্যাদি নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, জ্ঞান-তপস্যা দ্বারা পূত ব্যক্তি আমার ভাব প্রাপ্ত হয় (মদ্ভাবমাগতাঃ ৪।১০) ‘মদ্ভাব’ কথাটি অনেক পরিষ্কার হইলেও কিঞ্চিং অস্পষ্টতা আছে। এই শ্লোকে (১।২) “মম সাধর্ষ্যমাগতাঃ”—দেহবন্ধন হইতে মুক্ত সিদ্ধ যোগিরা চরমে আমার স্বধর্ম্মতা লাভ করেন—এই উক্তিতে পরম অবস্থাটির স্বরূপ সর্বাধিক উজ্জ্বল।

জীব ঈশ্বর-তুল্যতা লাভ করে। ঈশ্বর হইয়া যায় না। গুণে, ভাবে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে তাঁহার মত হইয়া গিয়াও পৃথক্ থাকে। এই স্বধর্ম্মতার সীমা কতদূর তাহা বেদান্তসূত্র নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, “জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং”—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের শক্তি জীবের কোন দিনও হয় না। তবে হয় কি? এই শ্লোকেই বলিয়াছেন, “সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ” (১৪ঃ) সৃষ্টিকালেও জন্ম হয় না, প্রলয়কালেও ব্যথিত হয় না। অর্থাৎ জন্মমৃত্যু অতিক্রম করেন। তাৎপর্য্য এই যে, চরমে জীব ও ঈশ্বরের ধর্ম্ম এক হইয়া যায় কিন্তু ধর্ম্মী পৃথক্ই থাকে। শিবত্ব ধর্ম্ম, শিব ধর্ম্মী। জীবে জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব হয়, কিন্তু সে শিব হইয়া যায় না। অতএব বোঝা গেল জীবে ও ঈশ্বরে কতকাংশে বৈসাদৃশ্য থাকে। সুতরাং জীবের ভেদাভেদ স্বরূপে অবস্থিতিই গীতার হার্দ।

এই অধ্যায়ে সাতাইটি মন্ত্র আছে। পাঁচটি প্রকরণ আছে। প্রথম দুই মন্ত্রে (১—২) বক্তব্য বিষয়ের ভূমিকা। (৩—৫)

মস্ত্রে বিশ্বের পিতামাতা ও সন্তানের স্বরূপ । (৬—১৮) গুণত্রয়ের স্বভাব ও ফল । (১৯—২৫) ত্রিগুণাতীত অবস্থার কথা । শেষের দুই মস্ত্রে (২৬—২৭) ভক্তির ও ভগবানের গুঢ় তত্ত্ব-কীর্তন ।

ভূমিকা বলা হইয়াছে । এখন পিতামাতা ও সন্তানের সংবাদ । তিনিই পিতা, তিনিই মাতা এই সব ভাবের কথা “পিতাহমস্ম জগতো মাতা ধাতা” (৯—১৭) পূর্বেও বলিয়াছেন । কিন্তু নিজ অঙ্গুলি দিয়া পিতা ও মাতাকে পৃথক দর্শাইয়া গর্ভাধানের সংবাদ कहিয়া এমন ভাবে পিতৃত্ব, মাতৃত্বস্থাপন পূর্বে আর করেন নাই ।

আমি বীজপ্রদ পিতা, আর আমার গর্ভাধান স্থান প্রকৃতি । জড় গর্ভাধান হয় জড় ইন্দ্রিয়ের মিলনে । চিন্ময় পুরুষের গর্ভাধান দৃষ্টিপাতে, ঈক্ষণে, সংকল্পে ।

পিতৃমাতৃমিলন জাত সন্তান—সমস্ত ভূতগণ । জীব, পিতার কাছে পাইয়াছে—অণুচৈতন্য । মাতার কাছে পাইয়াছে ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ । অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, এই জগতে, আকাশে, দেবলোকে এমন কোন প্রাণী বা বস্তু নাই যিনি প্রকৃতি-মাতার ত্রিগুণের হস্ত হইতে মুক্ত ।

“ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈন্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎত্রিভিগুণৈঃ ॥”

(১৮।৪০)

মাতৃদান ত্রিগুণ, পিতৃদান চৈতন্যকে আবৃত করিয়া রাখে । চৈতন্যকে পরম চৈতন্যের কাছে যাইতে দেয় না, বাঁধিয়া রাখে ।

(নিবন্ধিত)। তিনটি গুণের গতিবিধি কার্যকলাপ সব বুঝিয়া হইতে হইবে।

পৃথিবীর যেমন দুইটি গতি, একটি গতি তার নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ। অপরটি তার সূর্য্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ত্রিগুণেরও দুইটি ক্রীড়া। তন্মধ্যে একটি খেলা। নিজেদের তিন জনের মধ্যে। আর একটি জীবাত্মার সঙ্গে। প্রথমে প্রথমটি আলোচ্য।

সত্ত্ব শব্দটির সঙ্গে সত্তা শব্দের কুটুস্থিতি। কবিতা কাহাকে বলি? যাহার মধ্যে কবিত্ব আছে। সত্তা কাহাকে বলি? যাহার মধ্যে সত্ত্বগুণ আছে। সত্তা আছে সংসারের সকল সদ্বস্তুর। আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ এই বস্তুগুলির একেবারেই সত্তা নাই। তাহা ছাড়া জগতের সকল বস্তুরই সত্তা আছে। সুতরাং তাহাতে সত্ত্বগুণ আছেই। সত্ত্বগুণ না থাকিলে সত্তাই থাকিতে পারিত না।

সত্ত্বগুণকে চিনিবার উপায় কি? সত্ত্বগুণ নির্মল। নির্মল বলিয়া চারিটি বৈশিষ্ট্য—প্রকাশক, অনাময়, সুখমূলক ও জ্ঞানমূলক। এই চারিটি বিশেষণকে দুইটি ভাগ করা যায়। জ্ঞানমূলক বলিয়াই প্রকাশক আর অনাময় (নিরূপদ্রব্য) বলিয়াই সুখকর। একটি বস্তু যে আমার আছে ও প্রকাশিত হইতেছে তার কারণ হইতেছে সত্ত্বগুণ। আপনি যে আমার কাছে প্রকাশিত আছেন ইহার কারণ আপনাতে সত্ত্বগুণ আছে। প্রকাশিত আছেন বলিয়াই জানিতেছি আপনার সত্তা।

আর আপনি যে আছেন এই সত্তার বোধেই একটা সুখ

আছে। বেঁচে থাকাই একটা সুখ। সত্তাকে টিকাইয়া রাখাই একটা সুখ। নিজ সত্তার নিরূপদ্রব অববোধই সুখকর। ইহা সকলেই অনুভব করিতে পারে।

রজোগুণ শব্দটা আসিয়াছে রজঃ ধাতু হইতে। রজঃ অর্থ রঙান, রং করা। রজোগুণ রাগ ও দ্বেষ দ্বারা চিত্তকে রঙ্গায়। যা ছিল তা রাখে না, অন্তরূপ করিয়া দেয়। সত্তার অনুভব জন্য যে সুখ, যাহা সত্ত্বগুণের স্বভাব—রজঃ আসিয়া তাহাকে রঙ্গীন করিয়া দেয়। যেটা নিরাময় সুখ—সাদা ধবধবে, তাহাকে রাঙা করিয়া দেয়।

সাত

ত্রিগুণ ও গুণাতীত ভক্তিয়োগ

তমোগুণ অর্থ যে অন্ধকার করে। ভোগাসক্তি (তৃষ্ণাসঙ্গ)
ও কর্মাসক্তি (কর্মসঙ্গ) তাহার বাহন। অন্ধকারময়
আসক্তির কার্য্য হইল ঢাকিয়া রাখা। তমের কার্য্যই হইল
আবরণ। যাহা আছে তাহাকে দেখিতে না দেওয়া। সত্ত্বগুণের
যে প্রকাশ-স্বরূপতার কথা বলা হইয়াছে, তমঃ তাহাকে ঢাকিয়া
রাখে। সত্ত্বার সহজ প্রকাশকে তমঃ বাধা দেয়। “জ্ঞানমাবৃত্য
তু তমঃ” (৪।৯)।

সত্ত্বগুণের দুইটি ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে প্রকাশকত্ব ও
সুখময়ত্ব। প্রকাশকত্বকে ঢাকিয়া দেয় তমঃ, আর সুখময়ত্বকে
অতরুপে রং ধরাইয়া দেয় রজঃ। সুতরাং এই তিন গুণ পরস্পর
পরস্পরের কর্ম্মকে বাতিল (cancel) করিয়া দেয়। এই তিন
টিকমত থাকিলে কাহারই কোন অভিব্যক্তি থাকে না। তিনের
ক্রিয়ার ফল (resultant) হয় তখন শূন্য। ইহাকেই বলে
ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা (equilibrium)। তিনগুণ সাম্যাবস্থায়
পৌঁছিলে সৃষ্টি থাকে না। প্রলয় হয়। গুণত্রয়ের বৈষম্যেই
সৃষ্টি। পুরুষের ইচ্ছায় বা ঈক্ষণে এই সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিলে
তিনের মধ্যে মহাযুদ্ধ চলিতে থাকে। যুদ্ধের রূপটি বলিতেছেন—

“রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥” ১৪।১০

কখনও সত্ত্বগুণ, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়। কখনও রজোগুণ, তমঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয় এবং কখনও তমোগুণ, রজঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবলতা ধারণ করে। যে যখন যুদ্ধে জয়ী হয় তখন তার রাজত্ব চলে। 'সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ, তমের কার্য্য অপ্রকাশ। সত্ত্বের কার্য্য সুখ, রজের কার্য্য দুঃখ। রজের কার্য্য প্রবৃত্তি, তমের কার্য্য অপ্রবৃত্তি। ইহা হইতেই যুদ্ধ, বিচিত্রতা সুস্পষ্ট হইবে। এ ওকে মারে, সে তাকে মারে। ইহাই সৃষ্টির এক রহস্য— তিনগুণের লড়াই।

সত্ত্বগুণের ফল নির্মল সুখ, রজোগুণের ফল দুঃখ, তমোগুণের ফল অজ্ঞানতা (৯।১৬) ; সুতরাং কোন্টি আকাজক্ষনীয় সহজেই বোঝা যায়। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকালে দেহান্ত হইলে দিব্যালোক প্রাপ্ত হয়। রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কৰ্ম্মাসক্ত মনুষ্য মধ্যে জন্মে। তমোগুণের প্রবলতার কালে দেহত্যাগ করিলে পশ্বাদি যোনিতে জন্মলাভ করে (১৪। ৪-১৫)। সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ উর্দ্ধলোকে যান। রজোগুণীরা মনুষ্যলোকে থাকেন। তমোগুণীরা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। (১৪। ২)

যে রূপ ভাবে জীবন যাপন করিলে রজঃ তমঃ ক্লীণ হইয়া সত্ত্ব বর্দ্ধিত হইবে তাহা করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য। কোন্ কৰ্ম্মে কোন্ গুণ বাড়ে তাহার বিশদ বিবরণ পরে বলিবেন।

তিন গুণের পরস্পরের মধ্যে যে খেলা বা মল্লযুদ্ধ তাহা বলা হইল। এখন জীবাশ্মার সঙ্গে তিনগুণের যে আর একপ্রকার খেলা তাহা বলা দরকার। এই তিন গুণই শুদ্ধ আত্মার

আবরণ। এইজন্ত সত্ত্বগুণাঘ্রিত হইলেই পরম বস্তু লাভ হয় না। শুদ্ধ আত্মা যেন চৈতন্যের আলো। এই আলোকে ঢাকিয়া দেয় গুণের আবরণ। আলোর উপর যেমন চিমনি লাগান থাকে, সেইরূপ আবরণ।

চিমনিটা যদি ধোঁয়ায় কালো হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা ভেদ করিয়া আলোর প্রকাশ একরূপ হইবেই না। এইটি যেন তমোগুণের চিমনি। চিমনিটা যদি লাল রঙের হয় তাহা হইলে আলো দেখা যাবে কিন্তু প্রকৃত রূপ ব্যক্ত হইবে না। এইটি যেন রজোগুণের চিমনি। আলোকে তমঃ করিবে অপ্রকাশ রজঃ করিবে অন্তরূপ প্রকাশ। বেদান্তের ভাবায় রজের কার্য্য বিক্ষেপ, তমের কার্য্য আবরণ। যা আছে তাকে অন্তরূপ দেখানোর নাম বিক্ষেপ। যা আছে তাকে না দেখানো হইল আবরণ। রজস্তমের এই কাজ।

সত্ত্বগুণও একটা চিমনি বা আবরণ। তবে নির্মল আবরণ। মালিগশূন্য চিমনি। আলোটাকে ঠিক ঠিক দেখাইবে। কিন্তু আলোটার গায়ে কিছু ঠেকাইতে গেলে চিমনিতে ঠেকিবে। ঠিক আলোর কাছে পৌঁছিতে হইলে সত্ত্বগুণের চিমনিও খুলিতে হইবে। তাই ভগবান বলিতেছেন—

“গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।

জন্মমৃত্যুজরাহঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥” ১৪।২০

দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ তিনগুণ অতিক্রম করিয়া জীব জন্মমৃত্যু জরা-দুঃখের অতীত হইয়া অমৃতত্ব আশ্বাদন করে। অর্জুনকে তাই “নিষ্কৈশ্বর্য্যো” হইবার আদেশ দিয়াছেন (২।৪৫)।

সত্ত্বগুণের পরিচয় বলা হইয়াছে যে, যাহার সত্তা আছে তারই মধ্যে সত্ত্বগুণ আছে। এই নীতি অনুসারে চৈতন্যময় জীবাত্মারও সত্তা থাকায় তাহাতে সত্ত্বগুণ থাকিতে হইবে। এই জ্ঞাত প্রকৃতিজ যে সত্ত্বগুণ যাহা রজঃ তমের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহাকে মলিন সত্ত্ব নাম দেওয়া হয়। আর পরমাত্মা-আত্মার যে সত্ত্বগুণ তাহাকে শুদ্ধসত্ত্ব নামকরণ করা হয়। সুতরাং এই পরিভাষায় বলিতে হইবে জীবের সাধনা হইতেছে রজঃ তমঃকে অতিক্রম করিয়া মলিন সত্ত্বে আরোহণ—তারপর মলিন সত্ত্বকে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-সত্ত্বে স্থিতি। ইহার অপর নাম নিত্যসত্ত্বস্থঃ (২।৪৫) হওয়া।

পূর্বে যে সত্ত্বগুণের গুণ বর্ণনায় প্রকাশময়তা, জ্ঞানময়তা, সুখময়তা প্রভৃতি বলা হইয়াছে—উহারা প্রত্যেকেই মলিন। মলিন প্রকাশ, মলিন সুখ। মালিন্যপূর্ণ জ্ঞানই সত্ত্বগুণের কার্য্য। আর বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের স্বরূপ হইল - সত্য প্রকাশ, ব্রহ্মজ্ঞান ও চিদানন্দময়তা। নিশ্চল চিমনিও যেমন আলোর আবরণ—মলিন সত্ত্বও সেইরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বের আবরণক। এই জ্ঞানই গীতা সত্ত্বগুণের বর্ণনা কালেও “বন্ধাতি” ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন। সত্ত্বগুণ সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা আত্মাকে বন্ধন করিয়া রাখে। আত্মা বন্ধন-মুক্ত হয় শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিয়া।

কিরূপে জীব ত্রিগুণাতীত হইতে পারে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন অর্জুন পরবর্ত্তী প্রকরণে।

অর্জুন দুইটি কথা জানিতে চাহিয়াছেন। গুণাতীতের লক্ষণ ও আচার কিরূপ, আর কি উপায়ে গুণাতীত হওয়া যায়।

অর্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি, আচার ব্যবহার কিরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই প্রশ্ন আর সেই প্রশ্ন একই। অর্জুন তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন শুধু “জানিবার” জ্ঞান - এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন “হইবার” জ্ঞান। অর্জুনের একান্ত আগ্রহ গুণাতীত হইবেন—যদি পথের সন্ধান পান।

ভগবান অর্জুনের প্রশ্নে গুণাতীতের লক্ষণাদি বলিয়াছেন। পূর্বের স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে তো সব বলিয়াছি একথা বলেন নাই। গুণাতীতের বর্ণনায় একটি নূতন কথা বলিয়াছেন। যখন সাধক গুণাতীত হইবেন, তখন যে তার গুণের কাজ কিছু থাকিবে না, তাহা নহে। “গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং” (১৪।২৩), গুণসমূহ স্বকার্য্য করিতেই থাকিবে। তিনি উহাতে লিপ্ত হইবেন না।

দেহ থাকিলে ত্রিগুণের কার্য্য চলিতে থাকিবেই। গুণাতীত ব্যক্তি উদাসীনের ন্যায় সাক্ষীস্বরূপ হইয়া রহিবেন। গুণের কার্য্য সুখদুঃখে বিচলিত হইবেন না। নিন্দা প্রশংসায় তুল্য-বোধ করিবেন। কোন অবস্থাতেই চঞ্চলতা নাই (নেঙ্গতে)।

তৎপর গুণাতীত হইবার সহজ পথটি বলিতেছেন অতি সুন্দর করিয়া একটিমাত্র শ্লোক দ্বারা—

“মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে।

স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৪।২৬

অব্যভিচারী ভক্তিয়োগ সহকারে যিনি আমাকে সেবা করেন তিনি এই সকল গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন।

ভক্তিবাদের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব এইবারে সর্বাতিশায়ীরূপে সংস্থাপন করিলেন। একমাত্র ভক্তি দ্বারাই সাধক ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। চরম সাধ্যবস্তু শুদ্ধাভক্তি দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অব্যভিচারী ভক্তির কথা পূর্বের নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন। যে ভক্তি তার লক্ষ্য হইতে কখনও ভ্রষ্ট হয় না। যে ভক্তির আরাধ্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, তদুভিন্ন আর কিছু নহে, তাহা অব্যভিচারী ভক্তি।

এই ভক্তির সঙ্গে কৰ্ম্ম আছে। তাহা ভক্তির অনুগত। শ্লোকেই বলা হইয়াছে, আমাকে সেবা করে। কৃষ্ণসেবা দ্বারাই জীবের সম্ভার পরিপূর্ণতা। সেবা অর্থ সুখবিধান। যে কার্য্যে কৃষ্ণের সুখ হয় তাহাই করা, নিয়ত তাতে লাগিয়া থাকা ভক্তের কৰ্ম্ম। এই ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানও আছে। শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য ধন এই জ্ঞান। “কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।” সকল জ্ঞানের সার জ্ঞান হইল শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বজ্ঞান। সে জ্ঞানটির কথা পরবর্ত্তী শ্লোকে অধ্যায়ের শেষ মন্ত্বে অতি চমৎকার করিয়া কহিতেছেন

“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতশ্রাব্যস্য চ।

শাশ্বতস্য চ ধৰ্ম্মস্য সুখসৌকান্তিকস্য চ ॥” ১৪।২৭

মন্ত্রটির দুই প্রকার অর্থ হয়। আমি শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। আমি নিত্য, অমৃতের প্রতিষ্ঠা। আমি শাশ্বত, সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। আমি ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা পদে আশ্রয়, অবলম্বন, স্থিতি-স্থান বুঝায়।

আর এক প্রকার অর্থ হয়—আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্মস্বরূপ আমি। সেই ব্রহ্ম কে বা কিরূপ? যিনি অমৃতময়, অপরিণামী, যিনি নিত্যস্বরূপ, ধর্মস্বরূপ ও ঐকান্তিক সুখস্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত ভক্তিবোধে সেবা করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবে। কেন হইবে, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মে কি সম্বন্ধ এইরূপ জিজ্ঞাসা আসিলে, তাহার উত্তর আছে এই মন্ত্বে। আমি ও ব্রহ্ম অভিন্নই। কেবল অভিন্ন নই, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মের আমি স্থিতি-স্থান। মণির জ্যোতির স্থিতি-স্থান যেরূপ মণিতে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতি আমার অঙ্গপ্রভা।

“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং” পদের শ্রীধর অর্থ করিয়াছেন, “ঘনীভূত ব্রহ্মবাহং যথা ঘনীভূত প্রকাশ এবং সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বং।” বিরাট সূর্য্যের ঘনীভূত প্রকাশ যেমন সোনার থালার মত সূর্য্যমণ্ডল, সেইরূপ বিশ্বব্যাপী বিরাট ব্রহ্মবস্তুর আমি ঘনীভূত প্রকাশ।

এই মন্ত্বে কহিয়াছেন, আমাকে ভক্তি করিলে ব্রহ্মভাব পায়। সপ্তম অধ্যায়েও এইরূপ কহিয়াছেন—আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া যাঁহারা জরামরণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্ম যত্ন করে তাঁহারা সনাতন ব্রহ্মতত্ত্ব, সমগ্র আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও সমগ্র কর্মতত্ত্ব অবগত হন। (৭।২২)

অষ্টাদশ অধ্যায়ে আবার আরও নূতন কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা (:৮।৫৪) শ্লোকে।

ব্রহ্মভূত হইবার পর আমার পরাভক্তি লাভ করে। ভক্তি আর পরাভক্তিতে ভেদ করিয়াছেন। ভক্তিবাদের বিষয়ে

গৌড়ীয় আচার্য্যপাদেরাও করিয়াছেন—কৃষ্ণে ভক্তি হইলে ব্রহ্মভাব পায়। আবার ব্রহ্মভূত হইলে পরে আমার পরাভক্তি লাভ করে। তখন অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও উত্তম যে পুরুষোত্তম তাঁহার সেবা লাভ করে। ‘সেবাপ্রাপ্তি সমুদ্রমজ্জন।’

ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রতিমাস্বরূপ যে একটি পুরুষোত্তম তত্ত্ব আছেন, তাহা পরবর্ত্তী পঞ্চদশ অধ্যায়ে প্রকট করিবেন। চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষ মন্ত্র, পঞ্চদশ অধ্যায়ে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ।

— — —

আট

পঞ্চদশ অধ্যায়

গুহ্যতম শাস্ত্র

পঞ্চদশ অধ্যায়ে কুড়িটি মন্ত্র আছে। শেষ মন্ত্রে বক্তা ক্রীভগবান এই অধ্যায়ের বিষয়-পরিচয়ে একটি অপূর্ব কথা বলিয়াছেন।

“ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াহনঘ।”

হে নিষ্পাপ অজ্জুন! এই গুহ্যতম শাস্ত্র আমা কর্তৃক কথিত হইল। ইহা জানিলে মানুষ কৃতকৃতার্থ (কৃতকৃত্য) হয়।

‘ইতি’ শব্দটি সমাপ্তিজ্ঞাপক। এই ইতি, অধ্যায়ের সমাপ্তিগোতক। নিশ্চয়ই সমস্ত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি প্রকাশক নহে। কারণ গ্রন্থ তো এখন পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। অষ্টাদশ অধ্যায়ে যখন গ্রন্থ শেষ তখন আর একটি ‘ইতি’ আছে,—

“ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।” (১৮।৬৩)

এইটি গ্রন্থ শেষ জ্ঞাপক ইতি। পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকের “ইতি” অধ্যায় শেষের ইতি। আর কোনও অধ্যায়ের শেষে এইরূপ ইতি শব্দ দৃষ্ট হয় না। ইতি দিয়া বলিতেছেন, “ইদং শাস্ত্রং।” একটি মাত্র অধ্যায়কেই তাহা হইলে “শাস্ত্র” বলিতেছেন। ইহাতে বুঝা গেল এই একটি অধ্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমগ্র গীতাশাস্ত্র ইহার মধ্যেই আছে। গীতায় যাহা মুখ্য বক্তব্য তাহার সার নির্ঘাসটুকু এই অল্প পরিসর বিংশ

শ্লোকাত্মক অধ্যায়টির মধ্যে বিত্তমান রহিয়াছে। একটি অধ্যায়ই একখানি শাস্ত্র।

শাস্ত্র শব্দটির বিশেষণ দিয়াছেন “গুহ্যতমং”। এই গুহ্যতম শব্দ আর দুইবার আছে। নবমে ও অষ্টাদশে। নবম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন – “ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যামি।” অষ্টাদশ অধ্যায়ের যে “ইতি” শব্দের কথা পূর্বে বলা হইল তাহার পর – ইতি’র পর আবার পুনশ্চ (ভূয়ঃ) দিয়া গুহ্যতম সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন –

“সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।” (১৮।৬৪)
‘ভূয়ঃ শৃণু’ আবার শোন। দুইবার বলিয়াছি – একবার রাজবিজ্ঞা রাজগুহ্যযোগে, আর একবার পুরুষোত্তমযোগে, আরও একবার কহিতেছি – একবার দুইবার তিনবার। অষ্টাদশে গুহ্যতম বলিয়া যে শ্লোক দুইটি বলিয়াছেন তাহার। প্রথম শ্লোকের পূর্বার্ধ আর নবম অধ্যায়ের চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোকের পূর্বার্ধ একই মহা বাক্যের পুনরাবৃত্তি।

“মন্মনা ভব মন্ত্তো মদ্ব্যজী মাং নমস্কুরু। ৯।৩৪ ও ১৮।৬৫
নবম ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের যথাক্রমে চৌত্রিশ ও পয়ষষ্টি সংখ্যক শ্লোকের প্রথম দুই পাদ একই। শেষার্ধেও প্রায় একই প্রকার, কোন নূতন কথা আর নাই। বাহা বলা হইয়াছে তাহা মহিমা জ্ঞাপক। উভয় স্থানে বলা হইয়াছে, “মামেবৈষ্যসি” আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন, মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে মন দিয়া (যুক্তৈবমাগ্মানং মৎপরায়ণঃ) অষ্টাদশে বলিয়াছেন, সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমাকে বলিতেছি (সত্যং তে প্রতিজ্ঞানো)।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে গুহ্যতম শব্দের পরে আছে কৃতকৃতার্থতার কথা। এই গুহ্যতম সংবাদ জানিয়া মানুষ কৃতকৃত্য হয়। গুহ্যতম কথার পূর্বে আছে—যিনি এইরূপ ভাবে (এবম্) আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিতে পারেন (জানাতি পুরুষোত্তমং), তিনি সর্ববিদ্ হইয়া সর্বতোভাবে আমাকে ভজন করেন। এই ভজনের কথাই “মন্মনা ভব মন্তন্তঃ” শ্লোকে দুইবার কথিত হইয়াছে সমগ্র গ্রন্থে। এই শ্লোকের মধ্যে অশ্বদ্ শব্দের তিন চারবার প্রয়োগ। এই অশ্বদ্ শব্দবাচ্য যে পরম-বস্তু তাহাই ভজনীয় ধন-ভজনের পূর্বে তাঁহাকে জানিতে হইবে। উপাস্ত বস্তুকে ঠিক ভাবে জানিলেই উপাসনা সফল হয়। সাধ্যতত্ত্ব সিদ্ধান্তরূপে অবগত হইলেই সাধন প্রচেষ্টা সার্থক হয়। সুতরাং তাঁহাকে জানিতেই হইবে। যাহাকে জানিতেই হইবে তিনি পুরুষোত্তম।

পুরুষোত্তমকে জানিতেই হইবে। কিভাবে জানিতে হইবে—এবম্—এইভাবে। এই ‘এবম্’ এর বর্ণনাই পঞ্চদশ অধ্যায়টি অধ্যায়ের প্রথম হইতে অষ্টাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম তত্ত্ব স্থাপন করিয়া উনিশ শ্লোকে কহিলেন, ‘যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্’—এই প্রকারে আমার পুরুষোত্তম তত্ত্ব-সন্দেশ জানিবে। জানিয়া আমাকে ভজন করিবে। তার-পরই “ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রং।” সুতরাং গুহ্যতম শাস্ত্র বলিতে যে পঞ্চদশ অধ্যায়টিকেই বুঝাইয়াছেন ইহাতে কোন সংশয় নাই। নবম অধ্যায়ে গুহ্যতম শব্দে যে তত্ত্বের সংকেত, অষ্টাদশ অধ্যায়ে গুহ্যতম শব্দ দ্বারা যে তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি, পঞ্চদশ

অধ্যায়ে তাহারই পূর্ণ বিবরণ। একটি অধ্যায় বীজাকারে একটি বৃহদ্বস্ত্র।

নবম ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম শব্দটি নাই বটে তবে নবমে তাহার ‘পরং ভাব’ এর কথা আছে। শ্রীভগবানের মানুষী তনুই যে পরম ভাব এই কথা বলিয়াছেন (৯।১১)। এই পরম ভাবকে মূঢ়েরা জানে না, অবজ্ঞা করে (অবজানন্তি)। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া যাঁরা জানেন তাঁরা অসংমূঢ়। মূঢ়ের বিপরীত তারা। মূঢ়েরা অবজ্ঞা করে, অসংমূঢ়েরা জানে, ভজনা করে (জানাতি, ভজতি)। অষ্টাদশ অধ্যায়েতে পুরুষোত্তম শব্দটি না থাকিলেও, পরাভক্তি (১৮।৫৪) পরাশান্তি (১৮।৬২), মৎপরঃ, মৎ-প্রাসাদাৎ প্রভৃতি কথা (১৮।৫৬-৫৭-৫৮) পরিদৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যেও পুরুষোত্তম তত্ত্বের ইঙ্গিত।

পুরুষোত্তম তত্ত্বটি পুরুষোত্তম নিজে বলিয়াছেন পঞ্চদশ অধ্যায়েই। ইতিপূর্বে দুইবার অর্জুন শ্রীভগবানকে পুরুষোত্তম বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—

“স্বয়মেবাগ্নান্নানং বেথ ত্বং পুরুষোত্তম।” (১০।১৫)

আর “দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।” (১১।৩)

একবার বলিয়াছেন, হে পুরুষোত্তম! তুমি আপনিই আপনাকে জান এবং তাহা জান আপনা দ্বারা। আর একবার বলিয়াছেন, হে পুরুষোত্তম!—আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। এই পুরুষোত্তম তত্ত্বটি পুরুষোত্তমের শ্রীমুখে এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। ইহাই অধ্যায়ের বিশেষত্ব।

অধিভূতকে (৮৪) বলে ক্ষরভাব। ব্রহ্মকে বলে অক্ষর (৮৫)। ইহাদের অতীত বস্তুকে বলে পুরুষোত্তম। যাহা পরিণত হইয়া জগদ্রূপে প্রকাশিত তাহা ক্ষরভাব। ক্ষর নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের মধ্যে যিনি অপরিবর্তনীয়, যিনি নিত্য, সর্বগত, অচল, নিষ্ক্রিয় তিনি অক্ষর। ক্ষরের প্রকাশ বহুত্ব (multiplicity) অক্ষরের প্রকাশ একত্ব (unity)। এই একত্ব ও বহুত্ব যাঁর বিভাব তিনি পুরুষোত্তম। ক্ষরের বিকাশে জগদ্রহস্য, ইহা সদা ক্রিয়াপরায়ণ। অক্ষরে ব্রহ্মরহস্য, ইহা অচল, অপরিণামী ক্রিয়াহীন নীরব। পুরুষোত্তমের তত্ত্বে এই পরিণামী বহুত্ব ও অপরিণাম একত্ব এই উভয় কোটিই পর্যাপ্ততা প্রাপ্ত।

ক্ষরের তত্ত্বটি বিশ্বজগতের রহস্য কথা, উহা গুহ্য কথা। অক্ষর তত্ত্বটি পরব্রহ্মের পরম বার্তা, উহা গুহ্যতর তত্ত্ব। দুইয়ের-ও উদ্ধে পুরুষোত্তমের তত্ত্বটি গুহ্যতম সংবাদ। ক্ষর বস্তু গুণময়, অক্ষর বস্তু গুণাতীত। পুরুষোত্তম নিগুণোগুণী। বিশ্বাতিগ-বিশ্বগ। ক্ষর বস্তু সাকার কিন্তু বিকারী। অক্ষর বস্তু নিরাকার। পুরুষোত্তম নিরাকার হইয়াও সাকার। নির্বিকার হইয়াও আকারবান। অর্থাৎ তিনি চিদাকার চিদ্ঘনাকার। জীবের প্রাকৃত আকার,—পুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত আকার। তাহাই চিন্ময়ী মানুসীতত্ত্ব। ইহা গুহ্যতম সংবাদ।

যাহারা বলে প্রকৃতি হইতেই সব হইয়াছে, তাহারা প্রকৃতিবাদী। আধুনিকেরা প্রকৃতিবাদী (Naturalist)। তাহারা জগৎটাকে ভাসাভাসা দেখে—যা দেখে তাই বলে—বিশ্বের রহস্য

(mystery) কিছু ভেদ করিতে পারে না। যাহারা জানেন প্রকৃতি ঈশ্বরেরই অপরা প্রকৃতি (৭।৪), তাঁহারা গুহ্য কথা জানেন বটে। গীতা এই গুহ্য সংবাদ দিয়াছেন।

আর একদল আছে তারা বলে, পুরুষ অর্থাৎ মানুষ দ্বারা বিশ্বের সকল বস্তুর মূল্যায়ন হইবে। মানুষই একমাত্র মাপকাঠি, তাহাদিগকে বলে Humanist. তাহারাও নিখিল বিশ্বের রহস্য কিছু ভেদ করিতে পারে না। প্রকৃতবাদী বিজ্ঞান ও মানববাদী দর্শন বর্তমান যুগে মনুষ্য সমাজকে মহা বিনষ্টির পথে টানিয়া লইতেছে। গীতা বলিতেছেন এই পুরুষও (ব্যষ্টি জীব) একপ্রকার প্রকৃতি। ইহা ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি (৭।৫)। এই কথা যাহারা জানেন তাঁহারা গুহ্যতর সংবাদ রাখেন।

এই দুই, অপরা ও পরা প্রকৃতি, যাহার দুই বিভাব - যাহার বহিরঙ্গ ও তটস্থা শক্তিমাত্র সেই স্বরূপশক্তিতে সদা ক্রীড়াপরায়ণ লীলাপুরুষোত্তমের তত্ত্ব-রহস্য যাহারা জানেন, তাঁহারা জানেন গুহ্যতম বার্তা। এই তিন তত্ত্বের যে কোন একটি বা দুইটিকে উপেক্ষা করিলেও ভুল হইবে - তিনটিকে পৃথক্ ভাবিলেও ভুল হইবে। এক পুরুষোত্তমকে অঙ্গী ও অপর দুইকে অঙ্গরূপে জানিলেই তিনের সর্ব্বাঙ্গীণ তত্ত্ব পরিষ্কৃত হইবে।

ঐ তিনের কথা গীতায় ছড়ান আছে। কোথাও গুহ্যতত্ত্ব, কোথাও গুহ্যতর তত্ত্ব, কোথাও বা গুহ্যতম তত্ত্বের সঙ্কেত আছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ের বৈচিত্র্য এই যে, এখানে তিনকে অঙ্গাঙ্গিভাবে স্থাপন করা হইয়াছে। তিনের সম্বন্ধ নির্ধারণ পূর্ব্বক যথাযথ

পরিপ্রেক্ষিতে তিনবস্ত্র সূসম্বন্ধ হইয়াছে পঞ্চদশ অধ্যায়ে ।
 সপ্তম অধ্যায়ের ‘সমগ্রতা’ (৭।১) পুরুষোত্তম যোগেই পূর্ণতা-
 প্রাপ্ত হইয়াছে । এই হেতুই একটি ক্ষুদ্রায়তন অধ্যায় পূর্ণাঙ্গ
 শাস্ত্রের মর্যাদায় সমাসীন হইয়াছে । এক ক্ষুদ্রাকৃতি শালগ্রামে
 যেমন অখণ্ডমণ্ডলাকার পরব্রহ্ম সকল দেবদেবী সঙ্গে
 বিরাজমান—গীতার পঞ্চদশাধ্যায়ে তদ্রূপ অখণ্ড গীতা তাহার
 সকল মুখ্য তত্ত্ববার্তা সহিত প্রকাশমান ।

একটি অধ্যায়কেই যে ‘শাস্ত্র’ বলা হইয়াছে, ইহা আচার্য্য
 শঙ্করের দৃষ্টি এড়ায় নাই । আচার্য্য লিখিয়াছেন—

“যতপি গীতাখ্যং সমস্তং শাস্ত্রমুচ্যতে তথাপ্যয়মেবাধ্যায় ইহ
 শাস্ত্রমিত্যুচ্যতে স্ত্যতর্থং প্রকরণাৎ । সর্বোহি গীতাশাস্ত্রার্থোহ-
 ষ্মিন্নধ্যায়ে সমাসেনোক্তঃ ন কেবলম্ সর্বশ্চ বেদার্থ ইহ
 পরিসমাপ্তো ‘যস্তং বেদ স বেদবিৎ’ ‘বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদঃ’
 ইতি চোক্তম্ ।”

যদিও শাস্ত্র বলিলে এখানে সমস্ত গীতাকেই বুঝায় তথাপি
 এখানে শাস্ত্র অর্থ এই অধ্যায় মাত্র । কারণ ইহারই প্রকরণ
 চলিতেছে, সুতরাং এই অধ্যায়েরই স্তুতি করা হইতেছে, সমস্ত
 গীতাশাস্ত্রের যাহা অর্থ, তাহা সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে বলা
 হইয়াছে । শুধু তাহাই নহে সমস্ত বেদের যাহা অর্থ তাহাও
 এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—“যে তাঁহাকে জানে
 সেই বেদবিৎ” “সকল বেদের আমিই একমাত্র প্রতিপাদ্য ।”

এই শ্লোকে শ্রীভগবান অর্জুনকে সন্মোদন করিয়াছেন, হে

অনঘ ! অনঘ অর্থ নিষ্পাপ । নিষ্পাপ বলিয়াই অর্জুন এই
 অধ্যায় শুনিতে পাইলেন । এই অধ্যায় হৃদয়ঙ্গম করিতে
 হইলে আমাদিগকেও নিষ্পাপ হইতে হইবে । আবার এই
 অধ্যায়ের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলেই আমরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হইব,
 কৃতকৃতার্থ হইব ।

নয়

“অশ্বখ্যং প্রাহরব্যয়ম্”

পরিণামী এই বিশ্বজগৎকে একটি অশ্বখ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনা শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয় (কঠ ৬।১)। অতঃ কোন বৃক্ষ না হইয়া অশ্বখ বৃক্ষ কেন? অশ্বখ নামটির মধ্যে বেশ একটি শ্লেষ আছে সেই জন্য। ‘শ্ব’ শব্দটির অর্থ আগামী কল্য, ‘অশ্ব’ অর্থ যাহা আগামী কল্য পর্য্যন্ত থাকিবে। অ-শ্বখ শব্দের তাৎপর্য্য হইল আগামী কল্য পর্য্যন্ত টিকিবে না। সুতরাং অশ্বখ নামটির মধ্যেই বস্তুটির নশ্বরতার কথা পরিব্যক্ত হইয়া পড়িল।

এই জগৎ নশ্বর হইলেও পণ্ডিতেরা ইহাকে অব্যয় বলিয়াছেন। অব্যয় বলিতে বুঝায় অপরিণামী, নিত্য বস্তু। একটি বস্তু একই কালে নশ্বর ও নিত্য কেমন করিয়া হয়? ইহা এক রহস্য বটে। এই জগৎ-সংসার পরিণামী নিত্য। যেমন দিবা-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম সর্বদা পরিবর্তনশীল কিন্তু পরিবর্তনশীল রূপে ইহারা নিত্যকাল চলিতেছে—সেইরূপ। জগৎ প্রকৃতির বিকারজ বলিয়াই ইহা নিত্য পরিবর্তনশীল। আবার ইহার মূল উদ্ভে অতি উদ্ভে, ক্ষর অক্ষরের অতীত পুরুষোত্তমে বিद्यমান বলিয়া ইহা অব্যয়—নিত্য বিরাজিত।

প্রাকৃত জগতের বৃক্ষের মূল নীচে, শাখা উদ্ভে। এই সংসার-বৃক্ষের কিন্তু মূল উদ্ভে পুরুষোত্তমে। আর শাখা প্রশাখা

নিম্নগামী। মহত্ত্ব, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত এই সকল শাখাস্থানীয় বলিয়া ক্রমে নিম্নদিকে অধঃশাখ বলিয়াছেন। বেদশাস্ত্র বা অপৌরুষেয় জ্ঞানভাণ্ডারকে বলা হইয়াছে বৃক্ষের পত্রস্থানীয়। পত্রসমূহ বৃক্ষকে আচ্ছাদন করিয়া, কিছু কিছু খাণ্ড সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষের জীবন রক্ষা করে। সেইরূপ বেদ ধর্ম ও অধর্ম নির্ধারণ করিয়া ছায়ার মত বৃক্ষের আশ্রয় ও রক্ষাকারী।

বৃক্ষের কতকগুলি শাখা উর্দ্ধদিকে, কতকগুলি নিম্নদিকে। যেগুলি ধর্মের শাখা সেগুলি স্বর্গাদিমুখে, যেগুলি অধর্ম হইতে জাত সেগুলি নরকমুখী। বৃক্ষের বর্ধন হয় সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণ দ্বারা। গুণত্রয়ের সঙ্গে জগৎ প্রপঞ্চের সম্বন্ধ পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই বৃক্ষের, পল্লব হইতেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ (বিষয়-প্রবালাঃ)।

এই বৃক্ষকে ব্রহ্মবৃক্ষও বলা হয়, কারণ ব্রহ্মতেই ইহার মূল। ব্রহ্ম হইতে ইহা উৎপন্ন। কিন্তু জীবের সহিতও ইহার একটি কৃত্রিম সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই কথাটি বলিয়াছেন—“মনুষ্যালোকে কৰ্ম্মানুবন্ধীনি মূলানি অধশ্চ অনুসন্ততানি।” জীব-লোকে ধর্মাদ্বৈতরূপ কৰ্ম্মের কারণীভূত যে বাসনারূপ অবান্তর মূল সেগুলি নিম্নদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। অশ্বখ বৃক্ষের যেমন ঝুরি বা অবান্তর মূল নামে—নামিয়া মাটি কামড়াইয়া ধরে, সেইরূপ এই সংসার বৃক্ষেরও কতকগুলি কৃত্রিম মূল আছে।

আসল মূল হইল উর্দ্ধে পুরুষোত্তমে। এই কৃত্রিম মূলগুলি হইল নিম্নদিকে। এইগুলির স্বরূপ হইল জীবের বাসনা। বাসনা দ্বারাই জীব ধর্মাদ্বৈত প্রবৃত্ত হয়। জীবের ধর্মাদ্বৈত

ফল দিতেই প্রকৃতির পরিণাম হয়। এই জন্মই পূর্বের (৭।৫) বলা হইয়াছে “যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ”—জীবশক্তি দ্বারা এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে। প্রকৃতির বিকারজ দেহেন্দ্রিয়াদি ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ জীবের দেহে প্রাণ থাকে। জীবের দেহে প্রাণ থাকা না থাকা নির্ভর করে তার শুভাশুভ কর্মের উপর। তাই বলিয়াছেন, ‘কস্মানুবন্ধীনি।’

ভোগবাসনা রূপ কৃত্রিম মূল দ্বারা জীবকূল এই সংসার-বৃক্ষের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়াছে। এই জন্মই জীব ঈশ্বরকে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবন অশেষ দুঃখময় হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে ভগবান বলিয়াছেন যে, অনন্যা ভক্তিব্যোগে যে আমাকে সেবা করে সে ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব লাভ করে।

“স গুণান্ সমতীতৈত্যান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে” (১৪।২৬)। সংসার ক্ষয় হইলেই ত্রিগুণাতিত হয়। সংসার প্রপঞ্চটি কি, তাহা অতিক্রম করা অর্থ কি, সংসারের মূল কোথায় তাহা জানা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দিয়াই পঞ্চদশ অধ্যায়ে প্রথমে সংসার বৃক্ষের বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। বৃশ্চ ধাতু শব্দ প্রত্যয় করিয়া বৃক্ষ শব্দ হয়। বৃক্ষ শব্দের অর্থই হইল ছেদন যোগ্য। যাহাকে কর্তন করা যায়। এই সংসার বৃক্ষকে ছেদন করিতে হইলে কোথায় কাটিতে হইবে তাহা জানা প্রয়োজন। এই বৃক্ষের যে মূল উদ্ধে—পরব্রহ্মে, তাহা নিশ্চয়ই ছেদ্য নহে। তাঁছাড়া এই বৃক্ষ এত বিশাল যে, চেহারা কিছু অনুধাবন করা যায় না (ন রূপমস্তেহ তথোপলভ্যতে, ১৫।৩)। এই

বৃক্ষের কোথায় আদি, কোথায় অন্ত, কোথায় স্থিতি তাহাও স্থির করা যায় না (নান্তো ন চাদিন চ সংপ্রতিষ্ঠা) । সুতরাং ছেদনীয় স্থান কোন্টি তাহা জানা প্রয়োজন ।

জীবের ভোগবাসনা-জালরূপ কৃত্রিম মূলগুলির কথা যে বলা হইল ঐগুলিই ছেদনীয় । ঐগুলি ছেদন করা খুব সহজ নয় । উহা বড় সুদৃঢ় (সুবিরূঢ় মূলং), কারণ এই বাসনা অনাদি । তবে ভরসা এই যে, অনাদি হইলেও উহা সান্ত । আরম্ভ নাই কিন্তু শেষ আছে । ঐ বাসনাগুলিকে ছেদন করিতে যে অস্ত্র লাগিবে তাহার নাম দিয়াছেন “অসঙ্গ” । (অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিদ্ভা—১৫।৩) ।

সঙ্গ না থাকা হইল অ-সঙ্গ । সঙ্গ কি তাহা পূর্বে (২।৬২) বলিয়াছেন । “ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজ্জায়তে ।” বিষয়সকল চিন্তা করিতে করিতে মানুষের তাহাতে সঙ্গ জন্মে । সঙ্গ বলিতে বোঝা গেল বিষয়াসক্তি । এই আসক্তির অভাবের নাম অ-সঙ্গ । সুতরাং অসঙ্গ অর্থ হইল অনাসক্তি । বিষয়াসক্তি পরিবর্জনই অনাসক্তি । ইহার অপর নাম বৈরাগ্য । বৈরাগ্যের কথাও পূর্বে বলিয়াছেন (৬।৩৫) । চঞ্চল মনকে শান্ত করিবার উপায় বলিয়াছেন, ‘অভ্যাস ও বৈরাগ্য ।’

বৈরাগ্য কথাটির মধ্যে দুইটি ভাব আছে—একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি বিরাগ, অপরটি বিশিষ্ট কোন বস্তু অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি রাগ অর্থাৎ অনুরাগ । ভোগ্য বিষয় হইতে চিন্তকে দূরে রাখিতে হইবে । ঈশ্বরে মনকে নিযুক্ত রাখিতে হইবে এই দুইটি কার্য যুগপৎ করিতে হইবে । এখানে “অ-সঙ্গ” শব্দ দ্বারা

ইহাই বুঝাইয়াছেন। প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গ ত্যাগ ও অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গ লাভ। বাহ্যিক সঙ্গ হইতে মানস সঙ্গই বিশেষ মূল্যবান। বাহ্যিকসঙ্গ-শূন্য হইয়াও আন্তরসঙ্গ রাখিলে ফল লাভ হয় না। পক্ষান্তরে আন্তরসঙ্গ-শূন্য হইলে অনেক সময় বাহ্যিকসঙ্গ বিপদের হেতু হয় না। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থাকিতে বাহ্যিকসঙ্গ ত্যাগ সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় না। কিন্তু মানসসঙ্গ ত্যাগ সর্বদাই সম্ভব। এই জ্ঞানই বিষয় ধ্যান করিতে করিতে সঙ্গ হয় এই কথা বলিয়াছেন। এই শ্লোকে ‘অ-সঙ্গ’ বলিতে যাহা বুঝাইয়াছেন পরবর্তী শ্লোকে ‘জিতসঙ্গদোষা’ বলিতে সেই এক কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

অনাসক্তি-রূপ অজ্ঞ দ্বারা সংসারবৃক্ষকে ছেদন করিতে হইবে। ছেদন করিতে হইবে ভোগবাসনা-রূপ মূলগুলি। জীবের সঙ্গে সংসারের সম্পর্কটা কাটিবে। ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবশ্য থাকিবে। সংসারের সম্পর্কটা গেলে জীবের সঙ্গেও ঈশ্বরের সম্বন্ধ হইবে। তখন ঈশ্বরের সম্বন্ধের মাধ্যমে সংসারের সঙ্গে জীবের নূতন সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে। এই জ্ঞান যে পথ ধরিতে হইবে সেই পথের কথা বলিতেছেন—

“ততঃ পদং তৎ পরিমাণিতব্যং”

অশ্বখ বৃক্ষের কথা ও তাহার মূলচ্ছেদনের কথা বলা হইল প্রথম তিন শ্লোকে।

— — —

দশ

“তদ্ধাম পরমং মম”

পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিশটি মন্ত্র আছে। প্রথম দুই মন্ত্রে - অব্যয় অশ্বথ বৃক্ষের বর্ণনা। তারপর চারি মন্ত্রে (৩-৬) সেই অশ্বথ বৃক্ষকে ছেদন করিয়া কিভাবে যোগ্যতা লাভ করতঃ পরম পদকে অব্বেষণ করিতে হইবে সেই সন্ধান। পরম পদটি শ্রীভগবানের ধাম, সেই ধামের স্বরূপ কি তাহা জানাইয়া দেওয়া। পরবর্তী পাঁচমন্ত্রে (৭-১১) জীবের স্বরূপ ও তাহার উৎক্রমণের সংবাদ দিয়াছেন। অনন্তর সাতটি মন্ত্রে (১২-৮) ঈশ্বরের তত্ত্ব—তাহার ক্ষর-রূপ ও অক্ষর-রূপের কথা বলিয়া দুইয়ের অতীত পুরুষোত্তম তত্ত্বটি স্থাপন করিয়াছেন। এই শেষ প্রকরণ অনুসারেই অধ্যায়ের নামকরণ। শেষ দুই মন্ত্রে উপসংহার। উপসংহার সহ পাঁচটি প্রকরণ।

বৃক্ষের বর্ণনা ও তাহার ছেদন উপদেশ বলা হইয়াছে। এইবার পরম পদের কথা, সেখানে যাইবার পথ ও পথিকের কথা। মানব জীবন একটি যাত্রা। এ যাত্রার গন্তব্য স্থান জানিতে হইবে, পথের খবর লইতে হইবে। পথের বাধা সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। যাত্রীর যোগ্যতা ও তাহার স্বরূপ-তত্ত্বের জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে। এই অধ্যায় সেই সকল বার্তাই দিয়াছেন। এই বার্তাই বেদের বার্তা, জানিলেই “বেদবিৎ” হওয়া যায়।

একটি পরম পদ আছে, সেখানে পৌঁছিতে হইবে। এই স্থানের কথা গীতাগ্রন্থে বহু স্থলে আছে। প্রায় একই ভাষাতে বার বার বলা আছে। মদ্ভাবমাগতাঃ (৪।১০), মম সাধর্মাংমাগতাঃ (৪।২), সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ (৮।১৫), তমাহুঃ পরমাং গতিম্ (৮।২১), পরং স্থানমুপৈতি (১।২৮, অন্তঃস্তুমাং গতিম্ (৭।১৮), গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং (৫।১৭), একয়া যাত্যনাবৃত্তিম্ (৮।২৬), ন স ভূয়োহভিজায়তে (১০।২৩), তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে (১৪।১৪), জন্মমৃত্যুজরাহুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে (১৪।২), অমৃতভায় কল্পতে (২।১৫), ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (১৪। ৬; ১৮।৫৩) এই সকল মূলতঃ একই কথা। এই অধ্যায়েতেও দুই বার দুই ভাষায় একই কথা বলিয়াছেন—“যস্মিন্ গতান্ নিবর্তন্তিঃ ভূয়ঃ” (১৫।৪), এবং “যদ্ গতা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম” (১।১৬)। ঠিক একই ভাষায় (৮।২১) শ্লোকে বলিয়াছেন “যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম”। পূর্ববর্তী (৮।১১) শ্লোকেও একই কথা আছে—“মামুপৈত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।” বেদান্ত দর্শনের শেষ সূত্রে আছে “ন স পুনরাবর্ততে”। সেই পরম ভূমিতে পৌঁছিলে আর পুনরাবর্তন নাই। একটা ধর্মকর্মের চক্র ঘুরিতেছে। সব কিছুই আবর্তিত হইতেছে—“আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন” (৮।১৬)। কেবল একটি পরম পদ আছে যেখানে গেলে জীব এই আবর্তনের আওতার বাহিরে চলিয়া গেল। যাঁতা ঘুরিতেছে, ভারী পাথরের যাঁতা বেগে ঘুরিতেছে। তার তলে শস্তাদি চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে। কেবল যাঁতার মধ্যদণ্ডের গায়ে গায়ে গিয়া ঠেকিয়া আছে যে

অশ্রুগুলি তাহা চূর্ণিত হইতেছে না। সেইটি পরম পদ তাঁহার
নাম, নিখিল বিশ্বের মধ্যদণ্ড।

সেখানে না যাওয়া পর্য্যন্ত “অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসার-
বজ্রনি” অর্থাৎ মৃত্যুময় সংসার পথে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে
(৯৩)। একটি মৃত্যুর পথ, আর একটি অমৃতের পথ।
“দুঃখালয়মশাশ্বতম্ (৮।১৫)। আর একটি “পরং শান্তিং স্থানং
প্রাপ্যসি শাশ্বতম্” (১৮।৬২) এক পথে “ভোগা দুঃখযোনয় এব
তে” (৫।২২), আর এক পথে “সুখমক্ষয়মশ্রুতে” (৫।২)।

শাস্ত্রের উক্তি সুস্পষ্ট। ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। দুইটি
পথ একটিতে গেলে ঘুরিবে। ঘুরিতে ঘুরিতে মরিবে। দুঃখতাপ
জ্বালায় জ্বলিবে। আর একটি পথে চলিলে ঘোরাঘুরি নাই, সহজ
সরল ও সুন্দর যাত্রা - পরাশান্তি পাইবে, অক্ষয় সুখ পাইবে,
অমৃতময় হইবে। এই অমৃতময় পথে চলিতে কি প্রয়োজন
তাহা বলিতেছেন বড় সুন্দর করিয়া ১৫।৫ শ্লোকে।

“নির্মানমোহা,” মান চাইবে না, অমানী হইবে। মহাপ্রভুর
ভাবায়, -

“উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।

জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥”

মোহশূন্য হইতে হইবে। আমার মাতা, আমার পিতা, আমার
গৃহিণী, আমার গৃহ—নগ্নর বস্তুর প্রতি যে এইরূপ মমত্ব তাহাই
মোহ। এই মমত্বকে ত্যাগ করিতে হইবে। ইহার আর এক
নাম বলিয়াছেন “নির্দ্বন্দ্বম” (২।৭১)। “নির্মানমোহা” হইয়া সঙ্গ-
দোষ জয় করিতে হইবে। বিষয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার

সহিত সঙ্গ হয়। সঙ্গ হইতে বস্তুর প্রতি কাম বা আসক্তি জন্মে ইহাই সঙ্গদোষ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে থাকিলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের 'সঙ্গ' একেবারে ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু সঙ্গ থাকিলেও সাধক সঙ্গজনিত কামরূপ দোষ দ্বারা দূষিত হইবেনা। এই কথাই পুনরায় বলিয়াছেন, “বিনিবৃত্তকামাঃ” শব্দে “জিতসঙ্গদোষা” অর্থ পুনঃ পুনঃ সঙ্গ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ, আর “বিনিবৃত্তকামাঃ” পদে মনের কামনা-শূন্যতা বুঝাইবে। একটি দেহধর্মকে লক্ষ্য করিয়া অপরটি মানসধর্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। অথবা, “জিতসঙ্গদোষা” অর্থ কুংসিত বিষয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ভাষায় —

। “কুস্থানে গমন, আর কুদৃশ্য দর্শন,
কুস্পৃশ্য স্পর্শন, কভু কুভক্ষ্য ভক্ষণ,
কুসঙ্গ, কুরুচি, ক্রোধ, কুজনের অনুরোধ,
কুদান গ্রহণ, কভু কুগ্রন্থ পঠন,
এ সকল কায়মনে করিও বর্জন।”

এইরূপ হইলেই সুখ আর দুঃখ নামক বেদন্ব তাহা হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর যোগে যে সংবেদন তাহা যদি অনুকূল বলিয়া মনে হয় ও উহা আরও কিছু সময় থাকুক এইরূপ ইচ্ছা জাগে, তাহা হইলে তাহাকে ‘সুখ’ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, ঐ সংবেদন যদি প্রতিকূল বলিয়া মনে হয়, আর একক্ষণও যেন থাকে না এইরূপ ইচ্ছা জাগে, তাহা হইলে তাহাকে ‘দুঃখ’ এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কোন বস্তু বা ব্যক্তির গায়ে

সুখকর বা দুঃখকর এইরূপ বিশেষণ খোঁদাই নাই। যাহা আমার কাছে সুখ, তাহা হয় ত তখনই তোমার কাছে দুঃখ। যাহা এখন সুখদায়ক পরক্ষণে তাহা হয় ত দুঃদায়ক, একই ব্যক্তির কাছে। পূর্বের সুখ, দুঃখ সংবেদনকে “আগমাপায়ী” (: ১১৪) বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে উপদেশ “তাং স্তিতিক্ষস্ব” তিতিক্ষার সহিত সহ্য কর। সহ্য করিলেই দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হওয়া যায়। দ্বন্দ্বমুক্ত ব্যক্তিই ধীর। মহাকবির ভাষায়—

“বিকার হেতৌ সতি বিক্রয়ন্তে

যেবাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।”

বিকারের হেতু থাকা সত্ত্বেও যার চিন্তে বিকার হয় না, সেই ব্যক্তি ধীর। ধীর হইয়া সাধক সর্বদা আধ্যাত্মিকভাবে ডুবিয়া থাকিবে (অধ্যাত্মনিত্যা)। আত্মিক বিষয়ে নিষ্ঠাশীল হইয়া লাগিয়া থাকিবে। নিত্য চিরকাল মনকে ডুবাইয়া রাখিবে আত্ম-চিন্তায়। দেহেন্দ্রিয়কে সংযত করিবে ভৌম বিষয় হইতে। বৈষ্ণবাচার্য্যদের ভাষায়—

কৃষ্ণ ভিন্ন তৃষ্ণা ত্যাগ ও কৃষ্ণনিষ্ঠা।

কৃষ্ণতে চিত্ত লাগাইয়া রাখা ও কৃষ্ণ ভিন্ন জগৎ বিষয় হইতে চিন্তকে দূরে রাখা—ইহাই “অধ্যাত্মনিত্যা ও বিনিবৃত্তকামাঃ।” এবম্বৃত্ত সাধক-যাত্রীই অবিদ্যাশূন্য (অমৃতা) হইয়া সেই অব্যয়, পরম পদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

গচ্ছন্ত্যমৃতাঃ পদমব্যয়ং তং। ১৮।৫

অগ্রসর হইলেই পৌঁছান যায় না। নিজের চেষ্টায় গন্তব্য ভূমিতে উপস্থিত হওয়া যায় না। কেবল সাধনা দ্বারাই মানুষ

তঁাহাকে লাভ করিতে পারে না। প্রবচন দ্বারা, মেধা দ্বারা, বেদজ্ঞান দ্বারা বা অন্য কোন উপায় দ্বারা পরমতত্ত্বকে জানা যায় না।

“ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।”

তবে কী উপায়ে পাওয়া যায়? কোন উপায়েই না। পাইবার কোন পথ নাই তঁাহাকে? আছে—আমার সাধনা নয়, তঁাহার করুণা—“যমেবৈব বৃগুতে তেন লভ্যঃ” তিনি কৃপা করিয়া ঐহাকে বরণ করেন ঐহাকে ধরা দিয়া নিজেকে প্রকাশ করেন—শুধু সে-ই তঁাহাকে পায়। সাধনার সঙ্গে করুণার যোগ হইলেই তঁাহাকে পাওয়া যায়। সাধক সাধনা করিয়া হৃদয়ের কপাট খুলিলে, তিনি করুণা করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন। সাধনা না করিলে করুণা গ্রহণ করা যায় না। তঁাহার করুণাটি আসে, যখন ভক্ত-সাধক শরণাগত হন।

সত্যকার সাধনায় খানিকটা অগ্রসর হইলে পর সাধকের মনে হয়, তাহার সাধনার আর সামর্থ্য নাই। তখন সে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে “তমেব চাত্তং পুরুষং প্রপত্তে” (১৫।৪);—সেই পুরুষের শরণ লইলাম, সেই শ্রীহরিপুরুষের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম বলিয়া নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলে তবে শ্রীহরিকৃপায় হরি-প্রাপ্তি ঘটে। প্রাপ্তিটি কিন্তু করুণারই ফল—কিন্তু সাধন ছাড়া ঐ ফল ভোগ্য হয় না। “পর্জ্জন্মধারাবৎ করুণা।” মেঘের বৃষ্টির মত কৃপাধারা। আপনি সাধনা করিয়া জীবন-জমি কর্ষণ করিয়াছেন। এখন কৃপার বর্ষণ যদি হয়, আপনি লাভবান হইবেন। আর সাধনহীন অকর্ষিত ভূমি যাহার

তাহার উপর করুণা বর্ষণ হইলে সে লাভবান হইতে পারিবে না। জল গড়াইয়া যাইবে, অ-কর্ষিত ভূমি বপনযোগ্য হইবে না। তাই কর্ষণ ও বর্ষণের কথা এখানে একত্র করিয়া কহিয়াছেন।

পরম পুরুষের দুইটি পরিচয় দিয়াছেন। “আত্মা” যিনি আর যাহা হইতে চিরন্তন (পুরাণী) “প্রবৃত্তি: প্রমত্তা।” যিনি আদিপুরুষ ও যাহা হইতে চিরন্তন সংসার প্রবৃত্তি প্রবাহিত। অথবা, “আত্মা” পদে “আদিরসঃ” সকল রসের যিনি আদি, উৎস। পুরাণী প্রবৃত্তি হইল জীব-চিন্তের কামনা। সৃষ্টির আদিতে তিনি কামনা করিয়াছিলেন, “সোহকাময়ত বহুশ্রাং প্রজায়েয়।” বহু হইবার কামনাই আদি কামনা। সেই কামনাই পুরাণী। তাহাই নিখিল জীবের চিন্তভূমিতে প্রবাহিত। জীবের চিন্তে আসিয়া ঐ কামনা অনিত্য বস্তুনিষ্ঠ হইয়া বহুমুখী হওতঃ নিম্নগামী হইয়াছে। সেই জন্তই জীব দুঃখপাথারে ডুবিতেছে। এই কামনার প্রবাহটি উদ্ধগামী হইলেই তাহার কল্যাণ। বহুমুখী না হইয়া একমুখী হইলে, নশ্বর বস্তুনিষ্ঠ না হইয়া নিত্য বস্তুনিষ্ঠ হইলে তাহার কল্যাণ। চিন্তের কামনাকে ঐরূপভাবে কল্যাণদ করিবার উপায় হইল—শরণাগতি। তাহাই বলিয়াছেন—

“তমেব চাত্মং পুরুষং প্রপত্তে।”

জীবের হৃদয়ে যে একটি প্রবল রস-বাসনা আছে, রস আশ্বাদনের লালসা আছে, আনন্দ-ভোগের আকৃতি আছে, তাহার পূর্ণ তৃপ্তি ঘটে আদি-রসস্বরূপ পরম পুরুষের শরণাগতি গ্রহণ করিলেই। আমাদের অন্তরের সেই পুরাণী প্রবৃত্তি, তাহা

দিশাহারা হইয়া এদিকে ওদিকে ছুটিতেছে। ঐ প্রবৃত্তির যেটি উৎস-ভূমি সেখানে গেলেই প্রবৃত্তির দিগ্‌ভ্রান্তি কাটিয়া যাইবে। বিদেশে বিভূইয়ে চলিতে মানুষের দিগ্‌ভুল হয়, পূর্বকে পশ্চিম মনে হয়। কিন্তু কোনও প্রকারে নিজ গৃহে—যে গৃহে প্রথম দিকের জ্ঞান হইয়াছে—সেই স্থানে পৌঁছিলে আর ভুল থাকে না। পুরাণী প্রবৃত্তি যাঁহা হইতে প্রসৃত, তাঁহাতে প্রপন্ন হইলেই জীবের ভ্রান্তির গুরুতা ঘুচিয়া গিয়া শান্তির সরসতার প্লাবন আসে।

পরম-পদ-যাত্রীর পাথেয় ঠিক হইল। ‘কৃষ্ণ ভিন্ন তৃষ্ণা ত্যাগ’, কৃষ্ণনিষ্ঠা’, কৃষ্ণপদে শরণাগতি।’ তৎপরে যেখানে পৌঁছিতে হইবে সে ধামটির কথা বলিতেছেন। সেখানে গেলে যে আর প্রত্যাবর্তন নাই সে কথা বহুপ্রকারেই পূর্বের বলা হইয়াছে। এই স্থানে নূতন কথা বলিয়াছেন—

“ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।” (১৫।৬)
কথাটি ঐশ্বর্য মন্দের হুবহু উদ্ধৃতি। যে ধামকে সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি কেহই আলোকিত করে না। অথচ সে গোলোক ধাম সততই আলোময়। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নির যে আলো সেই আলোর যিনি আলো তাহা হইতেই ধামের আলো আসে। অথবা আরও ঠিক কথা—তিনি আর ধাম অভিন্ন। ঐশ্বর্য বলিয়াছেন, তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন।

“স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বমহিম্নীতি।”

ঋগ্বেদ এই ধামকে বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়াছেন। তিনি আর তাঁহার পদ অভিন্ন।

“তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ

দিবীব চক্ষুরাততম্ ।

তদ্বিপ্রাসো বিপত্তবো জাগ্ৰবাংসঃ সমিদ্ধতে

বিষ্ণোর্যং পরমং পদং ॥”

স্বায়েদ ১।২২।৫-৬।২৩

তাঁহার ধাম পণ্ডিতেরা দর্শন করেন শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা । তাহা উজ্জ্বল করেন স্তবকারী ভক্তেরা । নিজ অঙ্গজ্যোতির মধ্যেই তিনি নিত্য বিরাজিত । সাবিত্রী মন্ত এই জ্যোতিকে ভগ্ন বলিয়াছেন । এই জ্যোতি বস্তুতঃ পরম চৈতন্যের জ্যোতি ।

অন্ধকারে আলো দেয় প্রদীপ । প্রদীপ নিভিলে আলো দেয় চন্দ্র । চন্দ্র অস্ত গেলে সূর্য্য । সূর্য্য না থাকিলে আলো দেয় কে ? শ্রুতি উত্তর দিয়াছেন—আলো দেয় চৈতন্য । চৈতন্যের আলোই আলো । আলো বস্তু হইল স্ব-পর-প্রকাশক । এই স্ব-পর-প্রকাশকতা ধর্ম্ম চৈতন্যেরই আছে । সূর্য্যাদির স্ব-প্রকাশকতা, চৈতন্য হইতেই ধার করা । শ্রীভগবানের পরম ধামকে নিত্য আলোকিত করে তাঁহার চৈতন্য, তাঁহার চিহ্নিত্ব ।

সূচীভেদে অন্ধকার গৃহে আপনি আছেন । জিজ্ঞাসা আসিল—আপনার ঘরে কে আছে, কোথায় কি আছে, কি ভাবে আছে । আপনি কোন কিছুই উত্তর দিতে পারিতেছেন না । কেন না—অন্ধকার । শেষ জিজ্ঞাসা আসিল, ঘরে আপনি আছেন ? এবার আপনি নিশ্চিন্ত মনে, নিঃসংশয় ভাবে, দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিবেন হাঁ, আমি আছি । এমন দৃঢ়ভাবে উত্তর দিতে

পারিলেন, তাহার কারণ এই যে চৈতন্য স্বপ্রকাশ। আপনার আত্মা সেই চৈতন্যের কণা।

শ্রীভগবান চৈতন্যময় বস্তু। তিনি চৈতন্যের আধেয়। তিনি চৈতন্যের আধার। তিনি পরম চৈতন্যঘনবিগ্রহ। তাই সর্বদা নিজের উজ্জলতায় নিজে প্রকাশমান। তাঁহার বিন্দুর বিন্দু লইয়া চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি আলো দিয়া বেড়ায়। তিনি জ্যোতির্ময়, জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি ভিন্ন সমস্তই তমোময়। জ্যোতিবামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।” অজ্ঞানাদ্বারের পরপারে তিনি জ্যোতিঃ। তাই তো বেদের ঋষির প্রার্থনা—

“তমসো মা জ্যোতির্গময়”

অন্ধকার হইতে আমাকে আলোতে লইয়া যাও। স্বপ্রভায় চিরপ্রোজ্জ্বল তিনি। তাঁহার ধামই তিনি। তাহাই জীবের পরম স্থান, চরম সাধ্যভূমি।

পথের বাধা, পথ, পাথেয়, প্রাপ্য ভূমির বর্ণনা হইয়া গেল। এখন এই প্রাপ্তিযোগ হইবে বাহার, সেই পথিক জীবের পরিচয় দিতেছেন—

“মমৈবাংশো জীবলোকে

জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥” : ৫।৭

এগার

মমৈবাংশো জীবলোকে

পরম পদ বা শ্রীভগবদ্ধামের যাত্রী যে জীব তাহার পরিচয় দিতেছেন। এতক্ষণ পরে জীবের পরিচয় কেন? আরও আগে দেওয়া উচিত ছিল না? আগেও দিয়াছেন, সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

“অপরেয়মিতস্তৃণাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যাতে জগৎ ॥” ৭।৫

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই আটটি আমার অপরা প্রকৃতি। ইহা ছাড়া আমার আর একটি পরা প্রকৃতি আছে। তাহা জীবরূপা। তাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া আছে। অপরা-প্রকৃতিজড়ময়ী, পরা-প্রকৃতি চেতনময়ী দুইয়ের পার্থক্য এই। অপরা-প্রকৃতি ক্ষেত্র, পরা-প্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞা।

এই দুই প্রকৃতি হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এতদ্যোনীনি ভূতানি সৰ্ব্বাণীতু্যপধারয় (৭।৬)। প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধের কথা নানাপ্রকারে ত্রয়োদশ অধ্যায়েও কহিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে পরা-প্রকৃতি বা জীবশক্তির সম্বন্ধের কথা বিশেষ ভাবে আর বলা হয় নাই, এখন বলা হইবে। আগে পথ, পাথের, পথের কথা বলিয়া তার পর পথিকের কথা বলা কেন? যাত্রার কথা প্রায় শেষ করিয়া যাত্রীর পরিচয় দিতে বসি কেন?

বিশেষ প্রয়োজন, এইখানে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান। পরম পদ, গন্তব্য স্থান, সেখানে যাইবার উপায় বলা হইয়াছে। এখন প্রধান জিজ্ঞাস্য, ঐ ধামে তাঁহার পরম পদে, পৌঁছিবার অধিকার জীবের আছে কি না। তাঁহার কাছে পৌঁছিবার বাধা সংসার-বৃক্ষ, তাহা ছেদনের উপায় বলিয়াছেন। তন্নিষ্ঠ হইয়া তৎপ্রদাশ্রয়, ইহাই পথসম্বল তাহা বলিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার কাছে যাইবার যোগ্যতা জীবের আছে কি নাই তাহা জানা প্রয়োজন। যদি বলেন যোগ্যতা আছে, তাহা হইলেও জানা প্রয়োজন কোন্ তত্ত্বের উপর সেই যোগ্যতা নির্ভরশীল। অপরা-প্রকৃতির অধিকার নাই তাঁহার নিকটে যাইবার। অধিকার তো নাই-ই বরং কেহ যাইতে থাকিলে অশ্বখ বৃক্ষরূপে তিনি তাহার বাধকই হইয়া থাকেন। বৈরাগ্য-অসি দ্বারা বাধাকে ছেদন করিয়া তবে অগ্রসর হইতে হয়।

পরা-প্রকৃতি জীব ও পুরুষোত্তম ঈশ্বর এই দু'য়ের মধ্যে স্বরূপগত বা তত্ত্বগত কোন নিবিড় সম্পর্ক থাকিলেই দু'য়ের নিকট বর্ত্তিতা সম্ভব। এই জন্য সেই সম্পর্কটির কথা এখন বলা প্রয়োজন। অপরা-প্রকৃতি জড়, পরা-প্রকৃতি চৈতন্যময়ী। ঈশ্বর পরম চৈতন্যঘন। জড়-প্রকৃতির সামর্থ্য নাই যে পরম চৈতন্যঘন পুরুষের কাছে যায়। সে বরং তাঁকে আবরণই করে। চৈতন্যময়ী পরা-প্রকৃতির শক্তি আছে—চৈতন্যময় ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়ার। ইহার কারণ এই যে, চেতন জীবে ও পূর্ণ চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বরে অংশ ও অংশী সম্বন্ধ। ঈশ্বর অংশী, জীব অংশ।

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।”

অংশী আর অংশের মধ্যে সাদৃশ্যও থাকিবে বহু, বৈসাদৃশ্যও থাকিবে বহু। এক সমুদ্র জল, আর একবিন্দু জল। জল স্বরূপে দুই-ই এক। জলের যে উপাদান তাহার যে অনুপাত, সমুদ্রভরা জলে বাহা, বিন্দুপরিমিত জলেও তাহাই, এই সাদৃশ্য। আবার, সমুদ্র বৃহৎ, বিন্দুজল ক্ষুদ্র, এই বৈসাদৃশ্য। সেইরূপ ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, অংশ জীবও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, এই সাদৃশ্য। ঈশ্বর ভূমা বিরাট, অংশ জীব ক্ষুদ্র একটি কণা, এই বৈসাদৃশ্য।

জ্যোতিঃপুঞ্জ সূর্য্য অংশী ; একটি আলোর পরমাণু তাহার এক কণা। দুই-ই আলোবস্তু এই সাদৃশ্য। একেবৃহত্তা, অপরে ক্ষুদ্রতা এই বৈসাদৃশ্য। ঈশ্বর সনাতন, চির বর্তমান। জীবও সনাতন, চির বিরাজিত - এই সাদৃশ্য। আবার ঈশ্বর চিদঘন, জীব চিৎকণ এই বৈসাদৃশ্য। সূর্য্য আছেন সূর্য্যালোকে, তাহার আলোর কণা ছুটিয়া আসিয়াছে পৃথিবীতে। তিনি আছেন আনন্দময় নিত্য লোকে, জীব আছে জরামরণময় জীবলোকে, এই বৈসাদৃশ্য।

বনের দাবানল অংশী, একটি মাটির প্রদীপ অংশ। দুই-ই দগ্ধ করিতে পার, এই সাদৃশ্য। আবার, বাতাস প্রদীপকে নিভাইয়া দেয়, কিন্তু দাবানলকে উত্তরোত্তর বাড়াইয়া দেয়। এই বৈসাদৃশ্য। জীবকে মায়া আবরণ করিয়া স্বরূপ ভুলাইয়া দেয়। ঈশ্বরকে মায়া আবরণ করিতে পারে না। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ, এই বৈসাদৃশ্য।

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ-ঘন, জীব সচ্চিদানন্দ-কণ একথা বলিয়াছেন। ঈশ্বরের সত্তা পূর্ণ, চেতনা পূর্ণ, আনন্দও পূর্ণ। জীবের সত্তাও সীমাবদ্ধ, চেতনাও অপূর্ণ, আনন্দ অংশও মায়া দ্বারা সমাবৃত।

রজস্তুমোগুণ বা আবরণ-বিক্ষেপ হেতু জীবের আনন্দাংশ ঢাকা । ফলে জীব আনন্দহীন, আনন্দাভাস বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখকে জীব আনন্দ মনে করে। রজস্তুমোগুণের অপর নামই মায়া । সুতরাং মায়ার আবরণ হেতু সে আনন্দ-বঞ্চিত । মায়ামুক্তিতে সে আনন্দ পূর্ণ । জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে সকল জীবেরই চেষ্টা মায়ামুক্ত হইবার । ঈশ্বর নিত্যমুক্ত । জীব মায়াবদ্ধ, মুক্তি চায় । মুক্ত অবস্থায় থাকাই জীবের স্বরূপ । বদ্ধ অবস্থা তাহার স্বরূপভ্রষ্টতা । ঈশ্বর গোলোকে স্ব-স্বরূপে নিত্যস্থিত । জীব জীবলোকে স্বরূপচ্যুত হইয়া সতত গতিশীল ।

এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাঁহারা কোন বস্তুর সঙ্গে কোন বস্তুর সাদৃশ্যটা (similarity) বেশী দেখেন । মনস্তত্ত্ববিদেরা তাঁহাদিগকে বলে এস মাইণ্ড (S-mind) । আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাঁরা বস্তুর সঙ্গে বস্তুর পার্থক্যটা (Difference) বেশী দেখেন তাঁহাদিগকে বলে ডি-মাইণ্ড (D-mind) ।

যাঁহারা এস মাইণ্ড তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের সাদৃশ্যটা এত বেশী দেখেন যে, তাঁহারা ঘোষণা করিয়া দেন যে জীব এবং ঈশ্বর অভিন্নই । তাঁহাদিগকে বলে অভেদবাদী । যাঁহারা ডি মাইণ্ড তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের বৈসাদৃশ্যটা এত বেশী দেখেন যে তাঁহারা ঘোষণা করিয়া দেন জীব এবং ঈশ্বর চিরকালই ভিন্ন । তাঁহাদিগকে বলা হয় ভেদবাদী । যাঁহাদের দৃষ্টি সহজ, সরল ও সুন্দর, কোন একদিকে হেলান নয়, তাঁহারা বলেন জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ ভিন্ন ও অভিন্ন । তাঁহারা ভেদাভেদবাদী । গীতা নিজে কোন মতবাদী নয় । গীতা সত্যবাদী । গীতার সত্যবাণী যখন যার পক্ষে

যায় তখন সে উল্লসিত হয়। একই শ্লোকে অংশ, জীবলোক ও সনাতন এই তিন শব্দ প্রয়োগ করিয়া গীতা ভেদাভেদবাদীকে বেশী উল্লসিত করিয়াছেন।

ভগবদ্ধাম গতিহীন, অচল। জীবলোক গতিমান, সদা চঞ্চল। যেমন বাড়ী আর গাড়ী। আপনি যদি ভগবদ্ধামে নিজ বাড়ীতে যান, আপনি শান্ত, স্থির, অচঞ্চল হইয়া গেলেন। আপনি যদি গাড়ীতে উঠেন, অশান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। বাড়ীতে আপনি চলেন বসেন—সবই স্বাধীন ভাবে। গাড়ীতেও আপনি চলেন, পরাধীনভাবে। গাড়ীর গতি আপনার হাতে নয়। ইঞ্জিনের অধীন। ইঞ্জিনের বেগই আপনার বেগ। আপনার বেগের কর্তা আপনি নন, গাড়ীর ইঞ্জিন। আপনি জীবলোকের গাড়ীতে আছেন। “জীবলোক” চালায় ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি। সুতরাং “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ” (৩।১৭) প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা সকল কৰ্ম্ম সম্পাদিত হয় ইহা সার্থক উক্তিই বটে।

গাড়ীর মধ্যে আপনার এতটুকু স্বাধীনতা আছে, কারাগারে বদ্ধ কয়েদীর মত। আপনার স্বরূপ অণু-চিৎ বলিয়াই এইটুকু আছে। গাড়ী ছাড়িয়া বাড়ী পৌঁছিলে পূর্ণ-চিৎ সঙ্গে পরিচয় ঘটিলে আপনি পূর্ণ স্বাধীন। বাড়ীতে পৌঁছিলে আপনি “ব্রহ্মভূত” হন গাড়ীতে আপনি “জীবভূত” হইয়াছেন। সুতরাং শ্লোকের জীবলোকে ও জীবভূত শব্দদ্বয় জীবের বিশেষ পরিচয় জানাইতেছে।

জীব ঈশ্বরের অংশ—কিন্তু সনাতন অংশ। আপনার

হাতখানি আপনার অংশ। কিন্তু দেহ হইতে ভিন্ন করিলে উহা পচিয়া যাইবে। আপনার স্থায়িত্ব ও খণ্ডিত-হস্তের স্থায়িত্ব সমান হইবে না। জীব এইরূপ অংশ নহে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী বাহির হইয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন হইয়াছে কিন্তু পচিয়া যায় নাই। সূর্য্যের আলোকে, আকর্ষণে, তাপে পৃথিবী বাঁচিয়া থাকিয়া নিরন্তর সূর্য্যকে পরিক্রমণ দিতেছে। জীবও সেইরূপ। ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ হইলেও জীব নিয়ত সমঞ্জীবিত আছে তাঁহারই আকর্ষণে, তাঁহারই আনুগত্যে, তাঁহারই অনুকম্পায়। এই দৃষ্টান্তে অবশ্য পৃথিবীর সামর্থ্য নাই সূর্য্যের কাছে আবার যায়। কিন্তু জীবাত্মার সামর্থ্য আছে আবার পরমাত্মায় গিয়া স্বরূপে স্থিত হইতে। এই সামর্থ্যটুকু অণু-চৈতন্য জীবের সনাতন, কখনও নাশ্য নয়। এই সমর্থতা আছে বলিয়াই তো এত কথা চলে। অণু-চিৎ জীবের ঈশ্বরানুগত একটু অণু স্বাধীনতা আছে। স্বাধীনতা আছে বলিয়াই সং বা অসং ব্যবহার হইতে পারে।

অণু চিৎ জীব প্রকৃতিমুখীও হইতে পারে, ঈশ্বরমুখীও হইতে পারে। যখন প্রকৃতিমুখী হয় তখন জীবভাবগুলি বেশী ফুটিয়া উঠে। যখন ঈশ্বরমুখী হয় তখন দেবভাবগুলি বেশী ব্যক্ত হয়। নদী যতক্ষণ পাহাড়ের মধ্যে থাকে ততক্ষণ পাহাড়ের গঠন তাহার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। নদী যখন সাগরের নিকটবর্তী, তখন সাগরের অবস্থিতি তাঁহার গতির নিয়ামক হয়। জীব ঈশ্বরমুখী হইলে তাহার দৈবীসম্পদ অধিকতর প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে জড়া-প্রকৃতির দিকে ছুটিলে

আশ্রমিক ভাবগুলি বেশীমাত্রায় ব্যক্ত হইবার সুযোগ পায়। পরবর্তী দৈবাসুরসম্পদবিভাগ যোগে এসব কথা কহিবেন। চিং-কণ আত্মা জীবভূত হইয়া জীবলোকের যে গাড়ীতে উঠিয়াছেন, তাহাই তাহাকে চরম গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইবে না। অনেকবার গাড়ী বদল করিতে হইবে। এই গাড়ী বদলেরই শাস্ত্রীয় ভাষা “উৎক্রামণ”। এইবার উৎক্রামণের কথা বলিবেন।

মুক্ত হইয়া ব্রহ্মভূমিতে গেলেই জীব ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্ম-সংস্পর্শসুখ আশ্বাদন করে। অমুক্ত অবস্থায় গেলে ব্রহ্মের সান্নিধ্য হয় কিন্তু সুখানুভূতি হয় না। প্রলয়ান্তে যখন নূতন কল্লারম্ভ হয়, তখন মুক্ত জীব আর প্রত্যাবর্তন করে না। অ-মুক্ত জীব বাহির হইয়া আসে এবং নিজের ধর্মাধর্মবশতঃ যে সুখদুঃখ তং ভোগার্থ প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন মনঃ ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে। গাড়ী বদলাইতে মানুষ যেমন তাহার সঙ্গে বিছানাপত্র অথ গাড়ীতেও লইয়া যায়, তদ্রূপ জীবাত্মা যখন একদেহ ছাড়িয়া আর একদেহে যায়, তখন তাহার কার্যের জন্ত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয় সঙ্গে লইয়া যায়। কি ভাবে যে লইয়া যায় তাহা দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত দিয়াছেন — বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ লইয়া যায় সেইভাবে।

“বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াং”

জীবাত্মা যখন গোলোকে থাকে তখন চিন্ময় রস আশ্বাদন করে। যখন জীবলোকে আসে তখন “বিষয়ানুপসেবতে”— ইন্দ্রিয় গ্রাহ বিষয় উপভোগ করে। এই ভোগ-কার্যে তাহার

প্রয়োজন হয় শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শন, রসন, ভ্রাণ ও মন । ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই সে শব্দাদি বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া থাকে । এই জন্যই প্রত্যেকবার দেহরূপ গাড়ী বদল করিতে সে এই কয়েকটি দ্রব্য সঙ্গে লইয়াই চলে ।

জীবের এই দেহ হইতে দেহান্তরে যাতায়াত ক্রমাগত চলিতেই থাকে । কখনও সে গুণযুক্ত অবস্থায় স্থিত, কখনও বিষয়-ভোগরত, কখনও বা দেহান্তরে উৎক্রান্ত । ইন্দ্রিয়-মনযুক্ত সূক্ষ্ম দেহের আবরণে দেহী আত্মা যে চলিয়া যায় তাহা স্থূল চক্ষে দৃষ্টিগোচর হয় না । মূঢ়বী যারা তারা দেখিতে পায় না বলিয়া আত্মা অস্বীকার করে । যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাঁহারা আত্মাকে দর্শন করেন । যাদের চিত্ত মলিন (অচেতসঃ), যারা অকৃতাত্মা, তারা আত্মদর্শন করিতে পারে না । যাঁরা যথার্থ যোগী, শ্রীভগবানে যোগযুক্ত, তাঁরা দেহকে আত্মাতে অবস্থিত দর্শন করেন । মোটকথা আত্মা চিন্ময় । চিন্ময় চক্ষু হইলেই আত্মদর্শন হয় । জড় চক্ষুতে হয় না । চিদাত্মা চিং চক্ষুর গোচর ।

বার

“দ্বাবিমো পুরুষো লোকে”

জীবের প্রকৃত স্বরূপ, জীবলোকে তাহার দেহ হইতে দেহান্তরে উৎক্রামণ, বৈরাগ্য অস্ত্রে বাঁধন ছেদন; একনিষ্ঠ হইয়া আত্মনিবেদন-পথে গোলোক ধামে গমন—ইত্যাদি বিষয় বাহ্য পূর্বের নানা স্থানে ছড়ান ভাবে বলা হইয়াছিল, তাহা একস্থানে মালিকার মত গাঁথিয়া প্রকাশ করা হইল। এখন পরমপদ লাভ করিয়া ঐহার সন্নিধানে পৌঁছিতে হইবে সেই পুরুষোত্তম শ্রীহরির কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীহরির কথাই তো আগাগোড়া বলিয়াছেন। আবার বিশেষ করিয়া কহিতেছেন। কিছু নূতন কথা শুনাইবেন এই জ্ঞে বলা-কথা আবার বলিতেছেন। তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতে (প্রবেষ্টুং) হইবে একথা বলিয়াছেন। এইবার নিজেই নিজ স্বরূপতত্ত্বে বিশেষভাবে প্রবেশ করিবেন।

যার বাড়ীর দরজা তিনি নিজে খুলিলেই তো আমাদের অন্তরে প্রবেশের আশা। ছয়ার খুলিতে খুলিতে কহিতে লাগিলেন কৃপাময়, স্বীয় কৃপাশক্তির আবেগে।

শ্রীভগবানের দুইটি বিভাব। এক বিভাবে আছেন তিনি এই পরিবর্তনশীল জগতের সকল বস্তুতে অনুশ্রুত হইয়া। এই বিভাবের নাম ক্ষর-পুরুষ। আর এক বিভাবে আছেন

তিনি অপরিবর্তনীয় সকল বস্তুর মূলীভূত কারণের কারণ হইয়া ব্রহ্মরূপে। এই বিভাবের নাম অক্ষর-পুরুষ। ঋতি এই দুই পুরুষের সংবাদ দিয়াছেন, একটি বৃক্ষে দুইটি পাখী-রূপকে।

“দ্বানুপর্ণা সযুজা সখায়া।

সমানং বৃক্ষং পরিষষ জাতে।”

প্রথমে ঋর পুরুষের কথা কহিতেছেন। পূর্বেও বহুবার বলিয়াছেন, আবারও বলিতেছেন। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নির যে তেজ নিখিল বিশ্ব প্রকাশিত করে, তাহা আমারই তেজ। এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া আমিই নিজ সামর্থ্যে জগতস্থ জীবগণকে ধারণ করি। রসাত্মক সোমরূপে আমি ওষধি সকল পরিপুষ্ট করি, যাহা আহাররূপে গ্রহণ করিয়া জীব জীবনধারণ করে। প্রাণীগণের দেহে আমি বৈশ্বানর জঠরাগ্নিরূপে বাস করিয়া আহাৰ্য্য বস্তুসকল পরিপাক করি। বিশ্ব-প্রকাশক, ভূতধারক, খাওয়াদি পোষক ও পরিপাক-কারক—ইত্যাদি সকল-রূপে আমি বিশ্বের রক্ষণ পালনাদি কার্য্য করি।

অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, সোম, এই সকল বৈদিক দেবতা। ইহারা বস্তুতঃ আলাদা কোন দেবতা নহে। পরম পুরুষেরই এক একটি ভাবের রূপ ইহারা। সূর্য্য তাঁহার জ্ঞানশক্তি, চন্দ্র তাঁহার অনুভবশক্তি, অগ্নি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি, সোম তাঁহার করুণাশক্তি। এইভাবে সকল দেব দেবীই ঋর পুরুষের বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি।

তৎপর অক্ষর পুরুষের কথা বলিতেছেন। সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি আমি অন্তর্য্যামী রূপে। আমি

আত্ম-চৈতন্য। জীবের মধ্যে যে আত্মজ্ঞান, স্মৃতি-বিস্মৃতি, তাহা আমার জন্ম হয়। আমার এই স্বরূপটি অক্ষর বা অপরিবর্তনীয়। আমি কূটস্থ। জীব ও জগতের আমি নাগালের বাহিরে। অক্ষরই যে ব্রহ্ম এবং তিনিই যে কূটস্থ তাহা পূর্বেও কহিয়াছেন। অষ্টমে কহিয়াছেন “অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং” (৮।৩) একাদশে বলিয়াছেন, “তমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং” (১১।১৮), “ইমক্ষরং সদসত্ত্বং পরং যৎ” (১১।৩৭) ও দ্বাদশে বলিয়াছেন—

যে ব্রহ্মরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।

সর্বব্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ১২।৩

অক্ষর পুরুষ অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও নিত্য।

বেদ-সকল এই অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপের কথাই কীর্তন করেন, যাহাতে অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারা যায় সেই উপদেশই বেদ করেন। “বেদশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ” (১।৫।১৫), ব্রহ্ম-পুরুষের এক নামই বেদ। তিনিই বেদ। বেদ জানে তাঁকে, তিনি জানেন বেদকে। “বেদবিদেব চাহং” (১।৫।১৫)। বেদের রহস্তাংশের নাম উপনিষদ বা বেদান্ত। সেই বেদরহস্যের মূলেও অক্ষর-ব্রহ্মই। তাই তিনি বেদান্তকৃৎ। এই অক্ষর-ব্রহ্ম অনন্ত, অনাদি, অপরিবর্তনীয়রূপে নিত্যস্থিত। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে দুই প্রকারের বস্তু। এক পরিবর্তনশীল, অপর পরিবর্তন-হীন। যাহা পরিবর্তনশীল তাহা পরিণামী নিত্য। যাহা পরিবর্তনহীন তাহা অপরিণামী নিত্য। পরিণামী জগতের মূলে যিনি, তিনি ক্ষর-পুরুষ, অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ” (৮।৪),

অপরিণামী নিত্য বস্তুর যিনি কারণস্বরূপ তিনি অক্ষর-পুরুষ ।
উভয়কেই পুরুষ বলা হইয়াছে । পুরুষ অর্থ পুরীতে যিনি
শয়নে আছেন (underlying Reality), বহুত্বের গতির
মূলে ক্ষর পুরুষ, একত্বের স্থিতির মূলে অক্ষর পুরুষ ।
ক্ষর underlying Truth of multiplicity. অক্ষর
Underlying Truth of Unity.

সকল গতির মূলে ক্ষর । সকল স্থিতির মূলে অক্ষর ।
এই গতি ও স্থিতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—জড় ও চৈতন্যের
ক্রীড়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড । এই দুয়ের কথা শ্রুতি বলিয়াছেন—
“জ্ঞাজ্ঞৌ দৌ ঈশাবনীশৌ” (শ্বেতাশ্বতর) । জ্ঞ আর অজ্ঞ দুই
পুরুষ । এক ঈশ, অপর অনীশ । অজ্ঞ ও অনীশ তবুই ক্ষর-
পুরুষ । জ্ঞ ও ঈশ তবুই অক্ষর-পুরুষ ।

জড় জগতের মধ্য দিয়া যে ঈশ্বরের কার্য্য—চন্দ্র, সূর্য্য,
অগ্নি, পৃথিবী, ওষধি, জঠরাগ্নির মধ্যে যে তার ক্রিয়াশক্তি
তাহা ক্ষর-পুরুষের কার্য্য । ক্ষর-পুরুষ সাকার—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-
রস-গন্ধময় । অক্ষর-পুরুষ নিরাকার, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ,
অব্যয় । অক্ষর-পুরুষ চৈতন্যময়, জীবাত্তার হৃদয়ে অন্তর্ধ্যামী-
রূপে তিনি সন্নিবিষ্ট । জ্ঞান অজ্ঞানের যাবৎ ক্রিয়া তাহার জন্ত;
“তমক্ষরং সদসং তং পরং ।” যে মহাচেতনায় বিশ্বচৈতন্য বিধৃত,
অপৌরুষেয় জ্ঞানভাণ্ডার বেদের যিনি লক্ষ্য, বেদের যিনি বেত্তা,
রহস্যবিচার যিনি মূল রহস্য, তিনি অক্ষর-পুরুষ । সংক্ষেপে
তাই বলিয়াছেন—

“ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ।” (১৫।৬)

সর্বভূতের অন্তরে যে ঈশ্বর-সত্তা তাহা ক্ষর। বিশ্বচৈতন্যের
মূলে যে নির্বিষকার সত্তা তাহা অক্ষর। ক্ষর-পুরুষ গুণময়,
গুণময় জগৎ লইয়া তাঁর খেলা। অক্ষর-পুরুষ গুণাতীত, তিনি
সকল সত্তার মূলে বিরাজমান, পটভূমিকারূপে।

এক চিত্র অঙ্কনে দুইটি জিনিবের প্রয়োজন। এক নির্মল
দাগশূণ্য ক্যানভাস। অপর, তত্পরি বর্ণালীর বৈচিত্র্য। এই
বিশ্বচিত্র রচনায় নিরুপাধি নিগুণ অক্ষর-ব্রহ্ম হইতেছেন
ক্যানভাস-স্থানীয়। আর গুণময় ক্ষর-পুরুষ হইতেছেন তত্পরি
নানা বর্ণের বিচিত্রতা। এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই গীতার বক্তা
বলিয়াছেন—

“দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ” (১।১৬)
পরমহংসদেবের ভাবায়, অক্ষর একটি শাঁনাইর পোঁ — আর ক্ষর
অপর শাঁনাইর সঙ্গীতের মুচ্ছনা।

— — —

ভের

“উত্তমঃ পুরুষস্ত অন্যঃ”

উত্তমঃ পুরুষঃ—পুরুষোত্তমঃ। তু—কিন্তু। অন্যঃ—ভিন্নঃ। পুরুষোত্তম কিন্তু আলাদা বস্তু। যাহা বলা লইয়াছে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের কথা, তাহা হইতে পুরুষোত্তম কিন্তু পৃথক সত্তা। আপাততঃ মনে হয়, ঐ দুই পুরুষ - ক্ষর ও অক্ষর দ্বারাই নিখিল বিশ্বের সব কিছু ব্যাখ্যাত হয়, আর কোন কিছুর প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু, প্রয়োজনীয়তা আছে; তু শব্দটির মধ্যে এই তাৎপর্যটুকু লুকান।

পুরুষোত্তম ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন তত্ত্ব। কেন ভিন্ন? কারণ দিয়াছেন, তিনি ক্ষরের অতীত, এবং অক্ষর হইতে উত্তম। পরিবর্তনশীল বস্তুর তিনি উদ্ধে। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ভাষায়—“মায়িক সৃষ্টির সহিত কৃষ্ণের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। তিনি একলেশ্বর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।” এই স্বতন্ত্র ঈশ্বরই পুরুষোত্তম। উপনিষদ্ তাঁহাকে “পুরুষবিধঃ” বলিয়াছেন। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত তাঁহার সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—

“পুরুষ এবৈদং সর্বং”

অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও পুরুষোত্তম উত্তম। উত্তম বিশেষণের এইখানেই হেতু। চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষে মন্ত্রে বলিয়াছেন—আমি ধর্মস্বরূপ ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। ঘনীভূত ব্রহ্মস্বরূপ

আমি। ব্রহ্ম ধর্ম, আমি ধর্মী। ব্রহ্মসংহিতা বলেন—ব্রহ্ম
গোবিন্দের অঙ্গপ্রভা।

“যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-

কোটিষশেষবস্তুখাদি বিভূতিভিন্নম্।

তদব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” ৫১৪৬

যিনি কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বস্তুখাদি বিভূতিভেদে ভিন্ন
হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত, ব্রহ্ম ঐহার অঙ্গপ্রভা
আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। শ্রীশ্রীচৈতন্য-
চরিতামৃতের ভাষায়—

“তঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।

উপনিষদ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্মল ॥”

যে যাহা হইতে উত্তম সে তাহার সেব্য বা আরাধ্য বস্তু।
প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ভাষায়—“শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মেরও ধ্যেয় বস্তু।”
পুরুষোত্তম, পরম সেব্যধন। অক্ষর-পুরুষ যেন সেবক—ক্ষর জগৎ
যেন পূজার উপচার। গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ-বসন্ত, পশু-পক্ষী,
নর নারী, পাহাড়-পর্বত, নদ নদী, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা সবই
তঁার পূজার উপকরণ। পূজার উপচার নিত্য পরিবর্তনশীল,
নবায়মান। ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া যায় আবার ফোটে, সূর্য
উঠিয়া ডুবিয়া যায় আবার উঠে, মাস ভরিয়া চন্দ্রমা নিজ রূপ
বদলায়, মানুষ জন্মিয়া মরিয়া যায়, আবার জন্মে। পরমপুরুষ
নিজেকে নিজে সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাই তিনি
হইয়াছেন—সেব্য, সেবক, সেবাসামগ্রী।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—শরীর ক্ষেত্র, তাহার জ্ঞাতা জীবাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্বতঃ আমিহি। এই বিশাল বিশ্ব-শরীরই ক্ষর। আরাধক ক্ষেত্রজ্ঞ অক্ষর। আরাধ্য-বস্তু পুরুষোত্তম। শরীর যেমন কর্মের সাধন। এই ক্ষর জগৎ-তেমনই অক্ষরের সেবার সাধন পূজার সামগ্রী। পরম সাধ্যসম্পদ পুরুষোত্তম। ক্ষর অক্ষর পুরুষোত্তমেরই দুই বিভাব।

কর্মযোগের সার্থকতা, ক্ষর যাবতীয় বস্তুকে সেবাকার্য্যে নিয়োগে। জ্ঞানের পূর্ণতা অক্ষর স্বরূপের অনুভূতিতে। ভক্তির পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি পুরুষোত্তমে আত্মসমর্পণে। আত্ম-উন্মীলনে—সর্ব্বতোভাবে ভজনে (ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন, ১৫।১৯)। কর্ম-জ্ঞান ভক্তির অখণ্ড সমুচ্চয় তখনই হয়, যখন এক অদ্বয়-তত্ত্বকে আমরা ক্ষর অক্ষর পুরুষোত্তম তিন স্বরূপে ভোগ করি।

ক্ষর সাকার। অক্ষর নিরাকার। পুরুষোত্তম চিদাকার, আনন্দবিগ্রহ। ক্ষর জড়-বিকারী, অক্ষর নির্বিবকার, পুরুষোত্তম চিদ্ব্যন-বিকারী, ক্ষর ও অক্ষর তাঁহার দুই চিদ্বিভূতি। পুরুষোত্তমের তনু আছে, চিন্ময়ী মানুসী তনু। নবমে বলিয়াছেন—“মানুসীং তনুমাশ্রিতং (৯।১১)। এই মানুসী তনুটি তাঁহার “পরংভাব” একথাও বলিয়াছেন একই মন্ত্রে। চতুর্দশে ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বলিয়া সঙ্কেত করিয়াছেন এই পরম ভাবময় তনুরই। এই অধ্যায়ে পুরুষোত্তম নামে স্বরূপে সেই পরং ভাবেরই পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন। এইটি গীতার কেন্দ্রস্থ-

তত্ত্ব। ফুলের পাপড়িগুলি আগে ফোটে, মধ্যস্থ কিজ্জকটির পূর্ণ প্রকাশ হয় ক্রমে সর্বশেষে।

পুরুষোত্তমের দুইটি পরিচয় দিয়াছেন। “পরমাশ্বেত্যদাহতঃ” এবং “লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তি।” পরমাশ্রা, আশ্রার আশ্রা। ক্ষেত্র সম্বন্ধে ক্ষেত্রজের যে স্থান, ক্ষেত্রজ সম্বন্ধে সেই স্থান বাঁহার, দেহ সম্বন্ধে আশ্রার যে স্থান, আশ্রা সম্বন্ধে সেই স্থান তাঁহার। ক্ষরের সম্বন্ধে অক্ষরের যে স্থান, অক্ষর সম্বন্ধে সে স্থান বাঁহার, তিনি আশ্রার আশ্রা। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র উজ্জল অক্ষরেই লিখিয়াছেন -

কৃষ্ণমেনমবেহিহমাশ্রানমখিলাশ্রনাম্ (১.১১৪.৫)

রাত্রিকে উজ্জল করে চন্দ্র। চন্দ্রকে উজ্জল করে সূর্য। ক্ষরের প্রকাশের হেতু অক্ষর। অক্ষরের প্রকাশের হেতু পুরুষোত্তম। সাগরের উপরিভাগ তরঙ্গময়, তাহাকে ধরিয়া আছে নিস্তরঙ্গ জলরাশি। দুইকে ধরিয়া আছে জলধি। ক্ষরকে ধারণ করেন অক্ষর। অক্ষরকে ধারণ করেন তাহার প্রতিষ্ঠাস্বরূপ পুরুষোত্তম।

“বিভর্তি” শব্দে ভরণ পোষণ করেন। ক্ষররূপে পোষণের কথা পূর্বে বলিয়াছেন—সূর্য-চন্দ্র-অগ্নিরূপে জ্যোতি দেন। সোমরূপে ওষধি পুষ্ট করেন। বৈশ্বানররূপে আহাৰ্য্য পাক করেন। এই সকল ক্ষর-পুরুষের দেহ-দৈহিক পোষণ-পালনের কথা। পুরুষোত্তমরূপে ভরণপোষণ করেন আশ্রাকে, আনন্দায়তরস দিয়া। আশ্রা যখন তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া অক্ষর (ব্রহ্মভূতঃ) হইয়া তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করেন

(বিশতে), তখন পুরুষোত্তম তাহাকে পোষণ করেন নিজ মাধুর্য্যামৃত ঢালিয়া। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

“ডু ভৃঞ ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ।

ধরিল পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন।”

এই প্রেমধন দিয়া ত্রিভুবন ভরণেই বিভর্ত্তি শব্দের প্রয়োগসার্থকতা। কীভাবে এই পোষণ করেন তাহা বলিয়াছেন, “লোকত্রয়মাবিশ্ণু” তিন লোকে প্রবেশ করিয়া। পুরুষোত্তমে কিন্তু তিন লোকের অতীত (যস্মাংক্ষরমতীতোহহং) এবং অতীত হইয়া কিরূপে ত্রিভুবনে প্রবেশ করেন তাহা বলিয়াছেন চতুর্থ অধ্যায়ে।

“প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া” ৪।৬

নিজ প্রকৃতি অর্থাৎ স্বরূপা-শক্তিতে অধিষ্ঠান করিয়া নিজ মায়া—অর্থাৎ যোগমায়াদ্বারা চালিত হইয়া আমি প্রকৃতির অতীত হইয়াও প্রাকৃত জগতে প্রবেশ করি, আবির্ভূত হই, অবতার গ্রহণ করি।

প্রপঞ্চের অতীত হইয়াও পুরুষোত্তম লীলাবতার রূপে প্রপঞ্চে—তিন লোকে প্রবেশ করিয়া জীবাঁত্মাকে তাঁহার আশ্রয়বস্তুরূপে প্রেমরস তাহা দ্বারা পালন করেন। মহাপ্রভুর নিরূপম ভাষায়—

“কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য উপর,

বরষয়ে লীলামৃত ধার।”

পুরুষোত্তম যে নিরন্তর নিজ প্রিয়জন সঙ্গে প্রেমরসের খেলা করেন তাহা প্রতিনিয়ত শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ করিয়া

(সততং কীর্তয়ন্তো মাং ৯।১৪) জীবাত্মা ঐ রসমধুর আনন্দন লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণদেবের ভাষায় —

“যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ । ভাঃ ১০।৩৩।৩৬

পুরুষোত্তমের আর একটি পরিচয় দিয়াছেন “ঈশ্বর”। “ঈশ্বর” শব্দে ঈশনশীল পুরুষ। ঈশ ধাতু শীলার্থে বরচ্ছত্যয়। নিয়ত ইচ্ছা করাই যার কার্য্য। স্বমাদুৰ্য্য আনন্দনের লালসা যার স্বরূপে স্বতঃই বিরাজমান আছে। নিজ অনুসন্ধান, নিজ অনুশীলনে, নিজ অনুধ্যানে, যিনি নিয়ত নিমজ্জিত— তাহাতেই ঈশ্বর পদের প্রকৃষ্টবাচকতা। এই আনন্দন চাতুর্য্যেই পুরুষোত্তমের নিত্য লীলাময়তা প্রকটীভূত। লীলারস-বিলাস-পরতা লীলাপুরুষোত্তমের স্বরূপের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অগ্নি যেমন দগ্ধ না করিয়া এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করিতে পারে না, রাসলীলায় বিলাস না করিয়া পুরুষোত্তম সেইরূপ কখনও থাকিতে পারেন না। এই তাৎপর্য্যেই ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ সার্থক। ব্রহ্মসংহিতা এই তাৎপর্য্যেই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর কহিয়াছেন —

“ঈশ্বর পরমঃকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ”

ঈশ্বর শব্দের সঙ্গে অব্যয় বিশেষণ দিয়া লীলাপুরুষোত্তমের লীলার নিত্যত্ব সুদৃঢ় করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমের নিগূঢ় পরিচয় হইল, তিনি আত্মার আত্মা, তিনি নিত্য লীলাময়, তিনি ভুবনে নিজে প্রকট হইয়া সাধক ভক্তদের আত্মাকে চিন্ময় সুধারস প্রদান করতঃ প্রতিনিয়ত প্রতিপালন করেন।

শ্রুতি চৈতন্তের তিনটি অবস্থার সংবাদ দিয়াছেন।
বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ। পরম চৈতন্ত-স্বরূপের সেইরূপ
তিনটি অবস্থা। বৈশ্বানরের সমপর্যায় ক্ষররূপ, তৈজসের
সমতত্ত্ব অক্ষররূপ, আর প্রাজ্ঞ ভূমির সাগ্যে পুরুষোত্তম স্বরূপ।
এতদ্ভিন্ন চৈতন্তের আর একটি উচ্চাবস্থা আছে। শ্রুতি তাহার
নাম দিয়াছেন “তুরীয়”। পুরুষোত্তমের দুইটি অবস্থা। একটি
ক্ষর-অক্ষর লইয়া সৃষ্টিলীলায় আত্মসমাহিত। আর একটি
স্বমাধুর্য্য আত্মাদান বৈচিত্র্যে ক্রীড়ারত। এই স্বরূপে তিনি
নিত্য লীলাময়। এই লীলাময়ের অনুরূপ ভূমি তুরীয় চৈতন্ত।
কবিরাজ গোস্বামীর অক্ষরে—

“তুরীয় কৃষ্ণেতে নাই মায়া'র সম্বন্ধ।”

বেদের ঋষি পরম চৈতন্তবস্তুকে পাঁচটি স্তরে দর্শন লাভ
করিয়াছেন। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও
আনন্দময়। শ্রুতির অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় চৈতন্ত গীতার
ক্ষর পুরুষ। শ্রুতির বিজ্ঞানময় ভূমি গীতার অক্ষর-পুরুষ।
আনন্দময় স্বরূপ গীতার পুরুষোত্তম। পরব্রহ্মের আনন্দময়তাই
কিন্তু বেদের চরম দর্শন নহে।

“রসহেবাং লব্ধানন্দীভবতি”

“রসো বৈ সঃ”

তিনি রসস্বরূপ। রসাত্মক করিয়াই তাঁর আনন্দ - ইহাই
শ্রুতির চরম ও পরম সংবাদ। এই আনন্দঘন রসরূপতাই
পুরুষোত্তমের নিজস্ব স্বরূপ।

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়

২৭

পুরুষোত্তমের দুইটি অবস্থার কথা বলিয়াছি। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ভাষায় একটি নিরুপাধি, অপরটি মাধুর্য্য-বিগ্রহ। যখন তিনি নিরুপাধি তখন তিনি আত্মসমাহিত, একলেশ্বর, স্বতন্ত্র-ঈশ্বর। ক্ষর অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হইয়াও অতীত। আবার যখন তিনি মাধুর্য্য-বিগ্রহ তখন লীলা-বিলাসী, নিরন্তর ক্রীড়াপরায়ণ। স্বরূপ-শক্তির চিহ্নিলাসে, চিহ্নিভূতি নিজগণ সঙ্গে মহাভাবসমুদ্রে সঞ্চরণশীল।

ক্ষর গতিময় (dynamic), অক্ষর চিরস্থির (static), পুরুষোত্তম চিরস্থিরেই গতিমান (eternity-in-motion)। পুরুষোত্তমের চিরস্থির স্বরূপই নিরুপাধি। অনন্ত গতিমান স্বরূপই মাধুর্য্য-বিগ্রহ। ক্ষর পুরুষ সংস্বরূপ। অক্ষর পুরুষ চিৎস্বরূপ, পুরুষোত্তম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ক্ষর পুরুষ সত্য, অক্ষর পুরুষ শিব, পুরুষোত্তম সত্য-শিব-সুন্দর।

জীবের দেহ, মন, বুদ্ধি ক্ষর পুরুষের রাজ্যে। তাহার শুদ্ধ চেতনা অক্ষর পুরুষের সঙ্গে অভিন্ন। ইহার উদ্দেশ্য জীবের আর একটি স্বরূপ আছে। তাহার কার্য্য পুরুষোত্তমকে সর্বভাবে সেবা করা।

“স সর্ববিশুদ্ধজতি মাং সর্বভাবেন ভারত” (১৫।১৯), সর্বভাবে ভজনের দুইটি অংশ। আত্মনিবেদন ও সম্বন্ধস্থাপন। আত্মনিবেদন অংশটি একরূপ নিষ্ক্রিয়। নিজেকে ঢালিয়া দেওয়া, শ্রীপুরুষোত্তমের কাছে নিজেকে বিলাইয়া দেওয়া। ইহার অপর নাম আত্মনিষ্ক্রেপ, আত্মসমর্পণ। সম্বন্ধ স্থাপন অংশটি সক্রিয়। বিশেষ এক সম্বন্ধে নিজেকে পুরুষোত্তমের

কাছে খুলিয়া ধরা । নিজেকে উন্মীলন করিয়া নিজের মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া । তাঁহার নিজ-জন হইয়া যাওয়া । আগে তাঁহার মধ্যে আমার প্রবেশ, তারপর আমার মধ্যে তাঁহার প্রবেশ । আগে আমি তাঁহার, তারপর তিনি আমার । আগে আমি তাঁহার সেবক, তারপর তিনি আমার সর্বস্বধন । এই দুই মিলিয়া সর্বভাবে ভজন ।

এইরূপ সর্বভাবে ভজন যিনি করেন তিনি হন “সর্ববিং” । সব জানেন । সব জানার সার্থকতা, কিছু না জানায় । সব জানা যখন কিছু না-জানার সমান হয়, তখনই তাহা যথার্থ হয় । শব্দহীনতায় পূর্ণ কলসী আর শূন্য কলসী একই রূপ । জ্ঞানের পূর্ণতায় প্রেম । প্রেম নীরব-গীতি । জ্ঞানে প্রবীণ হইয়াও প্রেমিক-ভক্ত শিশুর মত । প্রোক্ত অজ্ঞ-মধুমঙ্গলের কত মধুরিমা । জ্ঞানমূর্তি অষ্টদ্বৈতের বালচাপল্য কত মধুময় । জ্ঞান-ঘন মূর্তি শ্রীগৌরসুন্দরের বালকের মত উক্তি কত মধুর—

“গুরু মোরে মূখ দেখি করিলা শাসন ।”

সর্ববিদের অজ্ঞভাব । পরমেশ্বরের মানুষ-ভাব, শ্রীহরি পুরুষের শিশুভাব—গৃঢ়কপট মানুষীলীলায় ইহাই মাধুর্য্যবত্তা । পরম-শিশু পুরুষোত্তমের মহামাধুর্য্যের আশ্বাদক যাহারা, তাহারাও সহজ সরল শিশু । পরাভক্তি বা প্রেমভক্তির উচ্ছলতায় তখন সর্বজ্ঞ ও সর্ববিং হইয়া যান রসজ্ঞ ও রসাস্বাদক, আরাধ্য-আরাধক । আরাধনায় হয় মধুরূপী, নিখিল বিশ্বে হয় মধুতরঙ্গের সৃষ্টি ।

মাধুর্য্য ভগবতার সার। মাধুর্য্য ভাগবতের সার, মাধুর্য্য
ভক্তের সার, ভক্তির সার। ভজনে বিশ্ব মধুময়। সর্ব্বভাবে
মিলন অল্পভবে—বৈদিক ঋষি গাহিয়াছেন—

মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিদ্ধবঃ

মাধ্বীনঃ সস্জোষধীঃ।

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ

মধু ত্তোরন্ত নঃ পিতা।

মধু-মন্নো বনস্পতি মধুমানন্ত সূর্য্যঃ

মাধ্বী গাবো ভবন্ত নঃ ॥

— — —

বার

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবী সম্পদ

গুহ্যতম শাস্ত্র জানিয়া জীব কৃতকৃত্য হয়, এই কথা বলিয়া পঞ্চদশ অধ্যায় শেষ করিয়াছেন। যে জানে সে হয় কৃতকৃত্য। যে জানে না সে অকৃতার্থ। তার কথা বলিয়াছেন সপ্তম অধ্যায়ে—মূঢ় লোক অজ্ঞ, অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না, “মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি”—৭।২৫। তাদের কথা নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন। সেই মূঢ় লোকেরা আমাকে অবজ্ঞা করে, “অবজানন্তি মা মূঢ়া”—৯।১১। ইহারা মোহজনক রাক্ষসী ও আশুরী প্রকৃতিপ্রাপ্ত—“রাক্ষসীমাশুরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ”—১২। এই সব লোক ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন, “অশ্রদ্ধাধনা” ইহারা পুনঃ পুনঃ মৃত্যুময় সংসারপথে ভ্রমণ করে, “মৃত্যুসংসারবর্ত্তনি।”

দুই প্রকারের জীব পাওয়া গেল। মহাত্মা আর মূঢ়াত্মা। যাহারা দৈবীপ্রকৃতিপ্রাপ্ত, সত্ত্বগুণাধিত, তাহারা মহাত্মা—“মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাপ্রিতাঃ”—৯।১৩, আর যাহারা রাক্ষসী ও আশুরী প্রকৃতিপ্রাপ্ত, রজস্তমোগুণাধিত, তাহারা মূঢ়াত্মা।

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে ইহাদের কথা বলা হইয়াছে অল্প অল্প। এই অধ্যায়ে তাহা বিস্তারে কহিবেন। অধ্যায়ের নাম বর্ণনীয় বিষয়ানুসারেই দৈবাস্মরসম্পদবিভাগ যোগ।

অধ্যায়ে চব্বিশটি মন্ত্র। তিনটি প্রকরণ। দৈবী-সম্পদ প্রকরণ ১—৩, আশুরী-সম্পদ প্রকরণ ৬—২০, নরকের দ্বার প্রকরণ ২১—২৪। পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষকথা, জীব কৃতকৃত্য হইয়া সর্বতোভাবে “আমাকে” ভজনা করে। এইরূপ যাহারা করেন তাহাদের স্বরূপ ও গুণক্রিয়ার কথা ইতঃপূর্বে চারিবার কহিয়াছেন। এইবার পঞ্চমবার কহিবেন। তাই নিজেই বলিয়াছেন “দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ” ১৬।৬।

(১) দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের জিজ্ঞাসায় স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিয়াছেন — ২।২৫ — ৭২ ;

(২) দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তের স্বরূপ বর্ণনায় বলিয়াছেন — ২।১৩ — ২০ ;

(৩) ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানীর লক্ষণ বর্ণনায় বলিয়াছেন—
১৩।৮ — ১২ ;

(৪) চতুর্দশ অধ্যায়ে অর্জুনের জিজ্ঞাসায় গুণাতীতের লক্ষণ বলিয়াছেন — ১৪।২২ — ২৫ ;

(৫) এই বোড়শ অধ্যায়ে দৈবীসম্পদ বর্ণনায় বলিবেন দৈবপ্রকৃতির কথা— ১৬।১ — ৩।

স্থিতপ্রজ্ঞ, ভক্ত, জ্ঞানী, গুণাতীত ও দৈবীসম্পৎশালী — এই পাঁচ পরিচয়ে একই বিশিষ্ট প্রকার চরিত্রবান ব্যক্তিদের কথা বলা হইয়াছে।

দৈব ও আশুর দুই প্রকারের জীব জগতে আছে, এ

কথা গীতা বলিয়াছেন—১৩।৬। বিষ্ণুপুরাণও ঠিক একই ভাবায় বলিয়াছেন। উহাদের লক্ষণে বলিয়াছেন :—

“বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আশ্রয়স্তদ্বিপৰ্যায়ঃ”

ভগবন্তুই দৈব, আর আশ্রয় তদ্বিপরীত অর্থাৎ ভক্তিহীন। সুতরাং ভক্তই দৈবসম্পদের অধিকারী। ছাব্বিশটি সম্পদের কথা বলিয়াছেন। সর্বপ্রথম বলিয়াছেন “অভয়”, সর্বশেষ বলিয়াছেন “নাতিমানিতা”। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্ত-লক্ষণে আছে স্থিরমতি, আর আছে “মানাপমানয়োঃ সমঃ”। আত্মতত্ত্বে, পরমাত্মতত্ত্বে চিত্ত স্থির হইলেই ভয়শূন্যতা বা নির্ভীকতা আসে। দৈবসম্পদের মধ্যে আছে অহিংসা, সত্য, শান্তি। ভক্তের লক্ষণে আছে মৈত্র, দৃঢ়নিশ্চয় আর গতব্যথ। দৈবসম্পদ মধ্যে আছে ক্রমা, শৌচ, অদ্রোহ। ভক্ত লক্ষণে আছে ক্রমা, শুচি, আর অদ্বেষ্টা। এইভাবে অনুসন্ধান করিলে প্রায় সবই মিলাইয়া লওয়া যায়।

দৈবসম্পদ মধ্যে আছে জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি। ইহার অর্থ যদি হয় জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, তবে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানীর লক্ষণের “অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং,” একই কথা। অথবা জ্ঞান-যোগব্যবস্থিতি অর্থ একইকালে জ্ঞানযোগ ও কৰ্মযোগে অবস্থিতি। জ্ঞানী হইয়া কৰ্ম্মাতীত হইয়া তারপর কার্য্য করিতে হইবে। ইহাই সমগ্র গীতার লক্ষ্য। অর্জুনকে জ্ঞানের ভূমিতে উঠাইয়া কৰ্ম্মাতীত করিয়া তারপর যুদ্ধরূপ কার্য্য করাইবেন। ইহা করাইতে হইলে অর্জুনের প্রয়োজন ভক্ত

হওয়া। জ্ঞান-কর্মের মিলন-ভূমিই ভক্তি। অথবা ভক্তির মানস-সরোবর হইতেই জ্ঞান কর্ম দুই প্রবাহিনী প্রকটিত। অতএব ভক্তিমান হইলেই জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি নামক দৈবী সম্পদের অধিকারী হওয়া বাইবে।

দৈবী সম্পদের মধ্যে দুইটি নূতন গুণের কথা কহিয়াছেন। অপৈশুণ্য ও অলোলুপহ। ইহাদের অর্থ যথাক্রমে পরনিন্দা-বর্জন ও লোভহীনতা। “অনিন্দুক হইয়া সদা লবে কৃষ্ণনাম”। অনিন্দুক হওয়া, অদোষদরশী হওয়া ভক্তের এক প্রধান গুণ। ভক্তেরও লোভ আছে—“লোভ সাধুসঙ্গ হরিকথা”, সজ্জন সঙ্গ ও ভগবৎকথাতেই ভক্তের লোভ। তন্নিহ্ন ইতর বস্তু হইতে ভক্তের লোভ ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। কামনাহীন বলিয়া ভক্ত শান্ত। শান্ত বলিয়াই ভক্ত শান্তির অধিকারী। শান্তি একটি দৈব সম্পদ। ইহা শরণাগত ভক্তেরই সম্পত্তি। শরণাগত ভক্তই ভয়হীন, ক্রোধহীন, লোভহীন। সেই ব্যবহারে ‘মুহু (মাদ্দবং)’ কর্মের মধ্যে অচপল। সুতরাং ভক্তিমান পুরুষই দৈবীসম্পদের অধিকারী। অথবা, দৈবী-সম্পদ আহরণ করিতে পারিলেই ভক্তিধনে ধনী হওয়া যায়। যাহাতে মানুষ দৈবী-সম্পদ লাভ করিতে পারে—এই লক্ষ্যে যদি সমাজের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলেই মানব-সমাজ শান্তিময় হইতে পারে।

যে ছাব্বিশটি গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে অতি সহজে লাভ হয় এমন নহে। এই সম্পদ হয় তারই, যে তদভিমুখে জাত—অভিজাতস্ত। কথাটির অর্থ হইল পূর্বজন্মের শুভ কর্মফলে সাংখ্যিক গুণসম্পন্ন পিতৃমাতৃক্ষেত্রে যাহারা জন্মগ্রহণ

করেন, তাঁহারাই ঐরূপ গুণী হইতে পারেন। পূর্বজন্মের উপর ছাড়িয়া দেওয়ায় হতাশ হইবার কিছুই নাই। বরং প্রত্যেক পিতামাতার সচেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন ঐরূপ সম্পদ লাভের জন্ত, যাহাতে তাহাদের গৃহে সত্ত্বগুণাধিত সন্তান আসে। বীজবপনের পূর্ব হইতেই ক্ষেত্র তৈয়ার প্রয়োজন—সেইরূপ সন্তানের পিতামাতা হইবার অনেক পূর্ব হইতেই সুসন্তান লাভের জন্ত প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। ইহারই শাস্ত্রীয় নাম পিতৃঋণ। যে আধ্যাত্মিক ভাবধারা, যে ঋষির ঐতিহ্য আপনি লাভ করিয়াছেন পিতাপিতামহের নিকট হইতে, আপনার সন্তান-ধারায় তাহাকে প্রবাহিত করাইয়া দেওয়া আপনার জীবনের এক শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন না করিলে পিতৃঋণ শোধ হইল না। ঋণ শোধ না করা একপ্রকার হীনতা, চৌর্য্য। চুরি করিলে সেজন্ত শাস্তিভোগ করিবেন। সংসারে, সমাজে ছুঃখ আসিয়া আপনার জীবন বেদনাময় করিয়া তুলিবে।

অর্জুনকে বলিয়াছেন,—অর্জুন! তুমি শোক করিও না (মা শুচঃ)। তুমি দৈবীসম্পদ অভিমুখেই জন্মিয়াছ (অভি-জাতোহসি)। তোমার ক্ষেত্র ও বীজ দুইই সত্ত্বগুণময়। স্মৃতরাং ক্লীবতা, কশ্মল, অজ্ঞানসংমোহ - এসব তোমার জন্ত নয়। অশৌচ্যের জন্ত শোক করাও তোমার সাজে না।

— — —

ভের আশুরী সম্পদ

বন্ধন আর মোক্ষ—ইহা লইয়াই শাস্ত্রের যত কথা।
মায়াবদ্ধ জীব কিসে মুক্তির আশ্বাদন পাইবে, ইহাই নিখিল
শাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। কি কারণে বন্ধন হয় ও কি
উপায়ে বন্ধনমুক্তি বা মোক্ষলাভ হয়, ইহা জানা একান্তই
প্রয়োজন। জীব মাত্রেরই জানা উচিত। নানাভাবে একথা
বলাও হইয়াছে। পুনরায় শ্লোকার্দ্দে সংক্ষেপে কহিতেছেন ;—

“দৈবী সম্পদ্বি বিমোক্ষায় নিবন্ধায়ামুরী মতা।”

মোক্ষের হেতু হইল দৈবী-সম্পদ। বন্ধনের কারণ হইল আশুরী-
সম্পদ। আশুর সম্পদ ত্যাগ করিয়া দৈবী-সম্পদে অধিকারী
হইলেই জীবের লক্ষ্যবস্তু লাভ হইল। অল্পকথায় যেন একটা
মৌলিক সমস্তার সমাধান দেখাইলেন।

বন্ধ আর মুক্ত, দুই প্রকারের জীব। বন্ধের সম্পত্তি আশুরি-
কতা, মুক্তের সম্পদ দৈবীভাব। দৈবীভাবের কথা অনেক বলা
হইয়াছে। এইবার আশুরিক ভাবের কথা বলিতেছেন।
আগে সংক্ষেপে বলিবেন, তাহাই পরে বিস্তৃত করিবেন। প্রথমে
সংক্ষেপোক্তি দম্ভ, দৰ্প, অভিমান, ক্রোধ, পার্শ্ব, অজ্ঞান এই
ছয়টি আশুরিক সম্পদ (১৬।৪)। এই ছয়ের মধ্যে অভিমান ও
ক্রোধ রজোগুণজাত। অজ্ঞান তমোগুণ জাত। অভিমান একটা
স্থায়ীভাবের মত। তাহা প্রকাশিত হয় দম্ভে ও আত্মস্ত্রিতায়।
ক্রোধময় যে স্বভাব তাহার প্রকাশ হয় দৰ্পে। আর অজ্ঞানতার

বহিঃপ্রকাশ ঘটে ব্যবহারের নিষ্ঠুরতায়, পার্শ্ববর্তী। সর্বদা আমি আমি এই আমি ও আমি বড়, আমি কর্তা, এই বোধই অভিমান। অভিমান আসিলে নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টা থাকিবেই।

“নিজেরে করিতে গৌরব দান,
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া,
ঘুরে মরি পলে পলে।”

এই প্রচেষ্টাই আত্মসত্তারিতা। অভিমানী জীবের এই দস্ত প্রতি কথায় ও কার্যে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এই আমি ও প্রসারের পথে যে হইবে বাধক, সে-ই হইবে ক্রোধের পাত্র। যে ব্যক্তি আত্মসত্তারী, অভিমানী, সে সর্বদাই বোধ করে তার চারদিকে সকলেই তার আমি ও প্রসারের বাধক। ফলে ক্রোধময় একটা ভাব তার স্বভাবগত হইয়া যায়। ক্রোধী ব্যক্তির ইচ্ছা জাগিবে সর্বদা যে ক্রোধের পাত্র তার ক্ষতি সাধন করিবার। আমার বিরোধী ব্যক্তিকে সায়েস্তা করিবার শক্তি আমার যথেষ্ট আছে, এবম্বূত যে হীন বিশ্বাস তাহাই দর্পের জনক। দর্পী ব্যক্তির মুখে আফালনাত্মক কথা লাগিয়াই থাকে।

অসত্য হইতে সত্যকে পৃথক করিবার সামর্থ্যাবাবই হইল অজ্ঞান। জ্ঞানহীন ব্যক্তির হৃদয় নাই অপরের বেদনা অনুভব করিবার। এইজন্য তার কাজকর্ম হয় কঠোর। ভাবা হয় কর্কশ। আচরণ হয় নৃশংস। ইহারই নাম পার্শ্ববর্তী। আত্মরিক

সম্পদের এই ভাবগুলি সংক্ষেপে একটি শ্লোকে (১৬৪) বলিয়া পরে বিস্তার করিতেছেন ।

যাহারা অজ্ঞান, তাহারা তমোগুণে আবৃত । তাহারা যে কেবল সত্য দেখে না তা নয়, কোন ধর্ম কার্যে তাদের প্রবৃত্তি জাগে না, অধর্ম কার্য হইতেও নিবৃত্তি আসে না । তাহারা বলে, শুচিতা, সদাচার সত্য বলিয়া কিছুই নাই (১৬৭) । এই দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা এই যে, ইহার মূলে কোন শাস্ত্র নীতি নাই । সৃষ্টির মূলে কোন পরম্পরা বা ধারা নাই । পরমপুরুষের ঈক্ষণে মূলপ্রকৃতির পরিণতি, তাহা হইতে মহত্ত্বাদি-ক্রমে জগতের সৃষ্টি ইহা তাহারা বিশ্বাস করে না (অপরম্পরসমুৎপত্তং । তাহারা ঈশ্বর মানে না । বলে ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই (জগদাহরনীশ্বরম্)) ।

যদি কেহ বলে, ঈশ্বর না মানেন, জগতের মূলে একটা কিছু তো মানিবেন : তাহারা তখন কতকগুলি মনগড়া অপসিদ্ধান্তের কথা বলে (অসদগ্রাহান্) । অপসিদ্ধান্তে বিশ্বাস করে বলিয়াই তাহারা সর্বদা অশুচিকার্যে ব্রতী থাকে (অশুচিব্রতাঃ) ।

জ্ঞান না থাকিলে যত ক্রটি হয়, তদপেক্ষা অধিক ক্রটি হয় মিথ্যাজ্ঞান থাকিলে । আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তির শুধু যে অজ্ঞান তাহা নহে । নবম অধ্যায়ে ইহাদিগকে বলা হইয়াছে “মোঘ-জ্ঞান” । মোঘজ্ঞান অর্থ ব্যর্থজ্ঞান । ইহাদের কাহারও কাহারও পাণ্ডিত্যও থাকে । কিন্তু সকলই ভ্রম্বে ঘটাহতি, ব্যর্থ, মিথ্যা ।

এই সকল লোক বিকৃতবুদ্ধি (নষ্টাশ্বানঃ), ক্ষুদ্রমতি । ইহাদের দ্বারা জগতের হিতকার্য কিছুই হয় না (অহিতাঃ), যাহা

কিছু করে সকলই ব্যর্থ (মোঘকর্মা)। সকলই বিশ্বমানবের অকল্যাণে পর্যাবসিত হয় (ক্ষয়ায়)। ইহাদের অন্তঃকরণ “দম্ভমান মদাশ্বিত” বলিয়া, ইহারা সর্বদাই একে ধরে মারে, তাকে ধরে মারে। আর মুখে বলে—তাদের মেরে দিয়েছি, এবার ওদের ঠিক করব। “অসৌ ময়া হত শত্রুর্হনিষ্যে চাপরান্”—১৬:১৪।

আত্মরী স্বভাবশালা ব্যক্তিদের আছে কেবল একটি বিষয়ে স্ফূট বিশ্বাস (এতাবদিত্তি নিশ্চিতাঃ ১৬:১১)। সেটি হইল এই যে, এই সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু আছে তাহাদের কামভোগের জন্য। কামভোগই জীবনের পুরুষার্থ (কামোপভোগ পরমাঃ)। ইহাদের চিন্তা সর্বদা কাম-ভোগের বস্তুর চিন্তায় ভরপুর। কেবল ভাবনা এটা পেয়েছি ওটা পাব। “ইদমত্ত ময়া লব্ধং ইদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্” ১৬:১৩। বিষয় চিন্তা ইহাদের অপরিমেয়, শেষ নাই। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই এক চিন্তা (প্রলয়ান্তঃ)। কিন্তু ছুপ্পূর্ণীয় লালসার তৃপ্তি নাই। জীবন কেবল কাম ভোগার্থ ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায় কাম পূরাইতে যে অর্থ প্রয়োজন তাহা অসম্ভবপায়ে উপার্জন করিতে ইহারা বিন্দুমাত্র পশ্চাদপদ নহে, “অন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্”। কেবল অসম্ভবপায়ে বলিলেই যথেষ্ট হয় না। নৃশংস উপায়ে উগ্রমূর্তি ধরিয়া (উগ্রকর্মাণঃ) কাম লালসার চরিতার্থতায় তাহারা সর্বদাই তৎপর থাকে (প্রসক্তাঃ কামভোগেষু)।

ইহারা অবিনয়ী (স্তব্ধাঃ), আত্মপ্রশংসাকারী (আত্মসম্ভাবিতাঃ) ও সদা ধন মানের গর্বে ক্ষীণ। যে স্থানে গুণ ভরা, সে স্থানে ইহারা দোষের আবিষ্কার করে (অভ্যসূয়কাঃ), সজ্জনদের নিন্দা

করা ইহাদের প্রকৃতিগত স্বভাব। অহংকার এত বড় যে, ইহারা জগতে নিজেকে ছাড়া আর কিছুই ভাল দেখিতে পায় না। মুখে বলে, “আমি প্রভু (ঈশ্বর), আমি ভোগের মালিক (ভোগী), আমি বলবান, আমি ধনবান, আমি অভিজনবান, কুলীন। সকল বিষয়ে আমি উত্তম। আমার তুল্য আর কে আছে। আমি যাহা খুসী করিব। যজ্ঞ করিব, দান করিব, ক্ষুণ্ণ করিব (মোদিঘ্যে), যে ভাবে ইচ্ছা চলিব, কে বাধা দিবে ?

বহুবিধ কল্লনায় ইহাদের চিত্ত ক্ষিপ্ত, মোহজাল জড়িত ও বিষয়াসক্ত। ইহাদের শেষ গতি কোথায়—অতি অপবিত্র নরকে। অথবা হীন ব্যাঘ্র, সর্প, কুমি, কীট যোনিতে। যাহারা আমাকে পায়, যাহারা দৈবী ভাবসম্পদে অধিকারী তাঁহাদের লাভ হয় উত্তম-গতি। আর যাহারা আমাকে না পায় (মামগ্রাপ্যৈব), তাহাদের হয় ঘৃণিত অধোগতি। তাহারা জীবকে হিংসা করে, সকল মানুষকে বিদ্বেষ করে, আমাকেও বিদ্বেষ করে, কারণ আমি তো সকল দেহেই আছি, তার দেহেও আছি (মামান্নপরদেহেষু—১৬।১৮)। আমি আলো—যে আলোকে বিদ্বেষ করে, সে তো অন্ধকারেই থাকিবে—নরকেই পচিবে।

— — —

চৌদ্দ

“ত্রিবিং ধনরকশ্চৈদং দ্বারম্”

আমাকে না পাইলে অধোগতি হয় (যান্ত্র্যধমাং গতিং), অধোগতির শেষ স্তরের নাম নরক। এখানে প্রবেশের তিনটি দুয়ার - কাম, ক্রোধ, লোভ। চরম পাতিত্যে পৌঁছবার এই তিন প্রশস্ত পথ। দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি স্বভাবের যে দোষগুলিকে প্রধান আশুরী-সম্পদ বলা হইয়াছে, তাহাদের মূলে আছে এই তিন রিপু। এই তিনের মধ্যে কাম ও ক্রোধের কথা পূর্বে বলিয়াছেন। “কাম এব ক্রোধ এব রজোগুণ সমুদ্ভবঃ (৩।৩৭)। কাম, ক্রোধ রজোগুণজাত। ইহারা ছুপ্পুরণীয়, অতি উগ্র। সংসারে ইহাদিগকে শত্রু বলিয়া জানিবে। যিনি কামক্রোধজাত বেগ প্রতিরোধ করিতে পারেন, তিনি সুখী (৫।২৩)। যিনি কাম-ক্রোধ বিযুক্ত তিনি ব্রহ্ম-নিব্বাণের মধ্যে বাস করেন (৪।২৬)।

এইরূপ কাম ও ক্রোধের কথা পূর্বে কয়েকবার কহিয়াছেন। লোভের কথা এই প্রথম তুলিলেন। লোভের জন্ম যে রজোগুণ হইতে একথাও একবার বলিয়াছেন (১৪।১২)। বস্তুতঃ কাম আর ক্রোধ এই দুইয়ের জন্মভূমিও লোভ। ভোগ্য বস্তু ভোগ করিবার জন্য যে লালসা তাহাই লোভ। লোভনীয় বস্তুর ভোগই কাম। অন্তর বা বহিরিন্দ্রিয়, উভয় দ্বারা ভোগ হইলেও তাহা কাম। কেবল অন্তরেন্দ্রিয় মন দ্বারা ভোগ হইলেও তাহা কাম-পদবাচ্য। কাম্যবস্তুর ভোগের

পথে যাহা প্রতিবন্ধক তাহা হটাইয়া দিবার জন্য যে উদ্বেষ্টপূর্ণ উত্তপ্ত প্রচেষ্টা তাহাই ক্রোধ। কামের মত ক্রোধও দৈহিক-মানসিক ও শুধু মানসিক, দ্বিবিধ হইতে পারে।

আপনার প্রচুর ধন আছে। উহা পাইবার জন্য প্রবল লালসা আমার অন্তরে। ইহাই লোভ। ঐ ধনগুলি পাইলে আমার কি প্রকার সুখ হইবে মনে মনে তাহা উপভোগ করা কাম। আবার ধন পাইয়া তাহা সম্ভোগ করাও কাম। ঐ ধন আপনার, উহা আমার করিবার পথে যত যত অন্তরায়, তাহা পথ হইতে সরাইয়া দিবার যে প্রবল চেষ্টা—মনের, দেহের বা উভয়ের, তাহাই ক্রোধের জনক।

রিপুব্রয় সর্বদা সংযুক্ত। একের সঙ্গে অণ্ডের গাঁটছড়া বাঁধা। একটি রিপু প্রশ্রয় পাইলেই অপর দুইটির আবির্ভাব হইতে পারে এমত প্রবল আশঙ্কা। লোভই হইল মূল। লোভ মানে ভোগ-লালসা। জীবনের সর্বাধিক দুর্দ্দেবের মূল হেতু হইল ভোগলালসা। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর জন্য যে অন্তরের লোলুপতা তাহাই সর্ববিধ অশান্তির হেতু, ইহা শ্রেষ্ঠ আচার্য্য-পাদগণের অভিমত।

এই ভোগবাসনার মূল উৎস কোথায় তাহাও যদি অনুশীলন করি তাহা হইলে কি পাওয়া যায়? বাসনা আত্মারই স্বভাব। আমরা ক্ষুদ্র জীব। সর্বদাই বড় হইতে চাই। আমরা অন্ধকারে আছি। সর্বদাই আলোতে যাইতে চাই। অপূর্ণ জীবের পূর্ণতা লাভের জন্য যে সহজ স্বাভাবিক আবেগ তাহাই বাসনা। এই আবেগ চিরদিনই মানবের অন্তরে আছে,

চৌদ্দ

“ত্রিবিং ধনরকশ্চৈদং দ্বারম্”

আমাকে না পাইলে অধোগতি হয় (যান্ত্র্যধমাং গতিং), অধোগতির শেষ স্তরের নাম নরক। এখানে প্রবেশের তিনটি দুয়ার - কাম, ক্রোধ, লোভ। চরম পাতিত্যে পৌঁছবার এই তিন প্রশস্ত পথ। দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি স্বভাবের যে দোষগুলিকে প্রধান আশুরী-সম্পদ বলা হইয়াছে, তাহাদের মূলে আছে এই তিন রিপু। এই তিনের মধ্যে কাম ও ক্রোধের কথা পূর্বে বলিয়াছেন। “কাম এব ক্রোধ এব রজোগুণ সমুদ্ভবঃ (৩।৩৭)। কাম, ক্রোধ রজোগুণজাত। ইহারা দুস্পূরণীয়, অতি উগ্র। সংসারে ইহাদিগকে শত্রু বলিয়া জানিবে। যিনি কামক্রোধজাত বেগ প্রতিরোধ করিতে পারেন, তিনি সুখী (৫।২৩)। যিনি কাম-ক্রোধ বিযুক্ত তিনি ব্রহ্ম-নির্বাণের মধ্যে বাস করেন (৪।২৬)।

এইরূপ কাম ও ক্রোধের কথা পূর্বে কয়েকবার কহিয়াছেন। লোভের কথা এই প্রথম তুলিলেন। লোভের জন্ম যে রজোগুণ হইতে একথাও একবার বলিয়াছেন (১৪।১২)। বস্তুতঃ কাম আর ক্রোধ এই দুইয়ের জন্মভূমিও লোভ। ভোগ্য বস্তু ভোগ করিবার জন্ম যে লালসা তাহাই লোভ। লোভনীয় বস্তুর ভোগই কাম। অন্তর বা বহিরিন্দ্রিয়, উভয় দ্বারা ভোগ হইলেও তাহা কাম। কেবল অন্তরেন্দ্রিয় মন দ্বারা ভোগ হইলেও তাহা কাম-পদবাচ্য। কাম্যবস্তুর ভোগের

পথে যাহা প্রতিবন্ধক তাহা হটাইয়া দিবার জন্য যে উদ্বেষ্টপূর্ণ উত্তপ্ত প্রচেষ্টা তাহাই ক্রোধ। কামের মত ক্রোধও দৈহিক-মানসিক ও শুধু মানসিক, দ্বিবিধ হইতে পারে।

আপনার প্রচুর ধন আছে। উহা পাইবার জন্য প্রবল লালসা আমার অন্তরে। ইহাই লোভ। ঐ ধনগুলি পাইলে আমার কি প্রকার সুখ হইবে মনে মনে তাহা উপভোগ করা কাম। আবার ধন পাইয়া তাহা সম্ভোগ করাও কাম। ঐ ধন আপনার, উহা আমার করিবার পথে যত যত অন্তরায়, তাহা পথ হইতে সরাইয়া দিবার যে প্রবল চেষ্টা—মনের, দেহের বা উভয়ের, তাহাই ক্রোধের জনক।

রিপুব্রয় সর্বদা সংযুক্ত। একের সঙ্গে অন্নের গাঁটছড়া বাঁধা। একটি রিপু প্রশ্রয় পাইলেই অপর দুইটির আবির্ভাব হইতে পারে এমত প্রবল আশঙ্কা। লোভই হইল মূল। লোভ মানে ভোগ-লালসা। জীবনের সর্বাধিক দুর্দ্দেবের মূল হেতু হইল ভোগলালসা। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর জন্য যে অন্তরের লোলুপতা তাহাই সর্ববিধ অশান্তির হেতু, ইহা শ্রেষ্ঠ আচার্য্য-পাদগণের অভিমত।

এই ভোগবাসনার মূল উৎস কোথায় তাহাও যদি অনুশীলন করি তাহা হইলে কি পাওয়া যায়? বাসনা আত্মারই স্বভাব। আমরা ক্ষুদ্র জীব। সর্বদাই বড় হইতে চাই। আমরা অন্ধকারে আছি। সর্বদাই আলোতে যাইতে চাই। অপূর্ণ জীবের পূর্ণতা লাভের জন্য যে সহজ স্বাভাবিক আবেগ তাহাই বাসনা। এই আবেগ চিরদিনই মানবের অন্তরে আছে,

থাকিবেও। ভ্রান্তিবশতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নশ্বর বস্তুর প্রতি এই বাসনা জাগ্রত হইলে, তুচ্ছ দ্রব্য পাইয়া সত্যিকার বড় হইতে চাহিলে, লোভ, কাম, ক্রোধ তিন শত্রু দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া জীবকে লইয়া যাইবে মহতী বিনষ্টির দিকে। পক্ষান্তরে, যাহা সত্য, শাস্ত ও সুন্দর বস্তু তাহার প্রতি ঐ লালসা জাগ্রত হইলে উহা ঈশ্বরানুভূত্যাগের জনক হইয়া লইয়া যাইবে প্রেম-আনন্দ-শান্তিময় মহামাদুল্যের দিকে।

এই কথাই (১৬।২২) বলিয়াছেন, অন্ধকারের দ্বারস্বরূপ (তমোদ্বারৈঃ) কাম, ক্রোধ, লোভ হইতে যে বিমুক্ত সে-ই আপন কল্যাণ সাধন পূর্বক পরাগতি লাভ করে। নিজ কল্যাণ সাধন “আচরত্যাগ্নঃ শ্রেয়ঃ” কথাটির অর্থ নিত্যবস্তুর সাধ্যবস্তুরূপ জানা ও তৎপ্রাপ্তির জন্ত একান্তিক চেষ্টাপরায়ণ হওয়া। যিনি কামাদির অধীন, তাহার প্রাপ্তি অধোগতি। যিনি কামাদি ত্যাগপূর্বক পরম মঙ্গল সাধনার্থ সচেষ্ট, তাঁহার প্রাপ্তি পরাগতি।

গৌড়ীয় আচার্য্যপাদগণ কথাটি আরও সুন্দর করিয়া বলেন। কামাদির মুখ ফিরাইয়া দিলেই কল্যাণ। অনিত্য-বস্তু লোভের লক্ষ্য হইল দুর্গতি। নিত্য-বস্তু কাম্য হইলেই পরাগতি।

“কৃষ্ণসেবা কামার্পণে

ক্রোধ ভক্তদেবী জনে,

লোভ সাধুসঙ্গ হরিকথা।”

এই ভাবে রিপুগুলির মুখ ফিরাইয়া দিবার উপায় কি তাহা বলিয়াছেন এই অধ্যায়ের উপসংহারে দুই শ্লোকে।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া যথেষ্টবাদী হইয়া কামকারতঃ খুসীমত কর্ম করে, সে না পায় ইহকালের সুখ, না পায় তত্ত্বজ্ঞান, না পায় পরকালে পরাগতি। শাস্ত্রবিধি মানিতে হইবে। শাস্ত্রে আছে মানুষের কর্তব্য লিপিবদ্ধ। কর্তব্য দ্বিবিধ, সামান্য ও বিশেষ। মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষের একটা কর্তব্য আছে। সেটার নাম মানবত্ব বা মনুষ্যত্ব ধর্ম। আর বর্ণ-আশ্রম ভেদে মানুষের যার যে কর্তব্য তাহা তাহার বিশেষ ধর্ম।

মনুষ্যত্ব ধর্ম বলিতে প্রধানতঃ পাঁচটি ধর্ম বুঝায়—

“অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচং সংযমমেব চ।

এতৎ সামাসিকং প্রোক্তং ধর্মশ্রু পঞ্চলক্ষণম্ ॥”

অহিংসা অস্তেয়, (অর্চোব্য) সংযম, শৌচ, সত্য। হিংসা-হীনতা, চৌর্য্যহীনতা, চরিত্রের সংযমতা, দেহ ও মনের পবিত্রতা এবং সত্যপরায়ণতা এই পাঁচটি গুণ থাকিলে মানব মানব-পদবাচ্য হয়। ইহা সর্বোপরি সকলেরই থাকা প্রয়োজন। শাস্ত্র নির্দিষ্ট ইহা সাধারণ (universal) কর্তব্য।

চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমভেদে যে কর্তব্য তাহা বিশেষ কর্তব্য। চারি বর্ণের কর্তব্য ক্রমে ব্যক্ত করিবেন। ব্রহ্মচারীর তপঃ, গৃহীর যজ্ঞ দান প্রভৃতির কথাও ক্রমে পরবর্তী অধ্যায়ে বলিবেন। বিশেষ কর্তব্যগুলি দ্বিবিধা—নিত্য ও পরিবর্তন-সহ।...যেমন গৃহীর পঞ্চযজ্ঞ নিত্যই করণীয়। দেশকাল-পাত্র-ভেদে কতগুলি শাস্ত্রবিধি আছে। সেগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনসহ। স্থানভেদে

কালভেদে পাত্রভেদে তাহার বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন করিয়া লইতে হয়। এইগুলিকে কেহ কেহ যুগধর্ম্য বলেন। জীবন্ত সমাজ ও জীবন্ত মানবের কর্তব্য যুগধর্ম্য সম্বন্ধে সজাগ থাকা। যুগধর্ম্যের নীতি অনুসারে পরিবর্তনে পরাজ্জ্বল ব্যক্তির বদ্ধ জলাশয়ের মত পচিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।

প্রাচীনকালে অধিকাংশ লোক শাস্ত্রানুগ ছিল। বর্তমান কালে অধিকাংশ নর-নারী শাস্ত্রবিমুখ। তাহারা প্রশ্ন করে শাস্ত্র মানিব কেন? গীতাকার বলিতেছেন

“তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ”

কর্তব্যাকর্তব্য নির্দ্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণ। রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিতে হইলে টাইমটেবল যেমন মানিতে হইবে, জীবের যাত্রা-পথে সূষ্ঠুভাবে চলিতে হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রকে সেইরূপই মানিতে হইবে।

ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি-নিবেধগুলি কোন ব্যক্তির মতলবে রচিত নয়। উহা বিশ্বজনীন বিধি। ঋষিদের ধ্যানদৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে—

“মা হিংস্রাং সর্ব্বভূতানি—

মা গৃধঃ কশ্যপ্শিৎ ধনম্ ॥”

প্রাণীদের হিংসা করিবে না। কাহারও ধনে লোভ করিবে না। এই উপদেশ কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। এগুলি বিশ্বের মূল তত্ত্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত (world constitutional)। চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলে যেমন আছাড় খাইয়া নাক মুখ ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা, ইহা যেমন

গতিশাস্ত্রের নীতি (Law of dynamics)—কাহারও মনগড়া নয়, সেইরূপ পরধনে লোভ করিলে তোমার জীবন-পথে বিড়ম্বনা, বেদনা নামিয়া আসিবে ইহাও সেইরূপ বিশ্বজগৎরূপ বিরাট প্রপঞ্চের মৌলিক বিধান। ধর্মচক্র যে ভাবে ঘুরিতেছে তাহার অনুবর্তন করিলেই কল্যাণ। বিপরীত মুখে চলিলেই নিদারুণ ব্যর্থতার সম্মুখীন হইতে হইবে।

“অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি” জগচ্চক্রের যে অনুবর্তন না করে ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত পাপজীবন সেই ব্যক্তির জীবনধারণ ব্যর্থ।

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষকৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেবচ ।

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কোন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২

ক্ষেত্রজ্ঞোহপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানিং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩

তং ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তং সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪

ঋষিভির্ব্রহ্মা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তির্বিবিন্শিতৈঃ ॥ ৫

মহাভূতাগ্ৰহকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬

ইচ্ছা দ্বেষঃ স্মৃৎসংস্কারঃ সংঘাতশ্চৈতন্যধৃতিঃ ।

এতং ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭

অমানিত্বমদন্তিত্বমহিংসা ক্ৰান্তিরাজ্জবম্ ।

আচার্যোপাসনং শৌচং স্নৈধ্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিভ্যঃ খন্দোবনুদর্শনম্ ॥ ৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অর্জুন বলিলেন

প্রকৃতি পুরুষ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যে আর ।
জ্ঞান, জ্ঞেয় সহ সব চাহি জানিবার ॥ ১

ভগবান বলিলেন

ক্ষেত্র নামে এই দেহ ক্ষয় অভিহিত ।
এই তত্ত্ব জ্ঞাত হলে ক্ষেত্রজ্ঞ বিদিত ॥ ২
সকল ক্ষেত্রেতে আমি ক্ষেত্রজ্ঞ যে হই ।
এই তত্ত্ব জানা হলে তারে জ্ঞাতা কই ॥ ৩
কিবা ক্ষেত্র ধর্ম আর সৃষ্টি ও বিকার ।
কেবা তিনি কি প্রভাব কহি তত্ত্ব সার ॥ ৪
বিভিন্ন ছন্দেতে বেদে গায় ঋষিগণ ।
ব্রহ্মসূত্রে সুনিশ্চয় বাক্যেতে বর্ণন ॥ ৫
পঞ্চভূত অহংকার অব্যক্ত প্রকৃতি ।
দশেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইচ্ছা দ্বেষ ধৃতি ॥
সুখ দুঃখ ক্ষেত্র আর ইন্দ্রিয় বিষয় ।
সংঘাত চেতনা বিকার কহি সুনিশ্চয় ॥
ক্ষমা শৌচ স্নৈহ্য যার আর সরলতা ।
শ্লাঘা দম্ব হিংসাহীন গুরু সেবা রতা ॥
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখের বিচার ।
বৈরাগ্য অনহং ভাব আছয়ে যাহার ॥ ৬—৯

[১১৮]

অসক্তিরনভিস্বপ্নঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
 নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০
 ময়ি চানন্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
 বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্ঞানসংসদি ॥ ১১
 অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
 এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ ১২
 জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ।
 অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বান্নাসত্ত্বাচ্যতে ॥ ১৩
 সর্ব্বতঃ পানিপাদং তৎ সর্ব্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।
 সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪
 সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
 অসক্তং সর্ব্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫
 বহিরন্তশ্চ ভূতানাংচরং চরমেব চ ।
 সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬
 অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
 ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রাসিষু প্রভবিষু চ ॥ ১৭
 জ্যোতিবামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
 জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বশ্চ খিণ্ডিতম্ ॥ ১৮
 ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ক্ষেত্রং সমাসতঃ ।
 মদন্ত এতদ্ বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপত্ততে ॥ ১৯
 প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্যানাংদী উভাবপি ।
 বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০

দারা পুত্র গৃহে নাই মোহের আসক্তি ।
 ইষ্টানিষ্টে সমভাব আমাতেই ভক্তি ॥
 লোকসঙ্গে বিরাগতা নির্জনে বসতি ।
 একান্ত অচলা নিষ্ঠা আমাতেই মতি ॥
 আত্মজ্ঞানে সদা রত মোক্ষের সন্ধান ।
 জ্ঞানের লক্ষণ এই অত্থা অজ্ঞান ॥ ১০—১২
 স্থূল সূক্ষ্মরূপাতীত পরব্রহ্মরূপ ।
 জ্ঞেয় ও জ্ঞাতব্য তিনি অমৃতস্বরূপ ॥ ১৩
 হস্ত পদ নেত্র মুখ শির সর্বদিকে ।
 ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া স্থিত কর্ণ দিকে দিকে ॥ ৪
 ইন্দ্রিয়বিহীন কিন্তু ইন্দ্রিয়-আশ্রয় ।
 নির্লিপ্ত নিগুণ কর্তা গুণভোক্তা হয় ॥ ১৫
 বহির্নির্ধ্য সর্ববজীবে বিশ্বচরাচরে ।
 অবিজ্ঞেয় সূক্ষ্ম তিনি দূরে বা অদূরে ॥ ১৬
 এক ব্রহ্ম সর্বভূতে দৃষ্ট বহুরূপে ।
 সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্তা তিনি সর্বরূপে ॥ ৭
 সকল জ্যোতির জ্যোতি তমসার পার ।
 জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞানগম্য হৃদয়ে সবার ॥ ১৮
 জ্ঞান জ্ঞেয় ক্ষেত্র কহি সংক্ষেপে তো আমি ।
 জানি তব্ব পেতে মোরে হবে যোগ্য তুমি ॥ ১৯
 প্রকৃতি পুরুষ দুই অনাদি জানিবে ।
 গুণ ও বিকার যত প্রকৃতি সম্ভবে ॥ ২০

- কার্যকারণকর্ত্ত্বৈ হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।
 পুরুষঃ সূক্ষ্ণঃস্থানাং ভোক্তৃষু হেতুরুচ্যতে ॥ ১১
 পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
 কারণং গুণসঙ্গোহস্ত্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥ ১২
 উপদ্রষ্টানুমত্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।
 পরমাশ্রুতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৩
 য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।
 সৰ্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ১৪
 ধ্যানেনোঅনি পশ্যন্তি কেচিদাঅনমাঅনা ।
 অশ্রে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ১৫
 অশ্রে হেবমজানন্তঃ শ্রদ্ধাশ্রেভ্য উপাসতে ।
 তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃতুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ১৬
 যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিং সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
 ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ তদ্বিক্রি ভরতর্ষভ ॥ ১৭
 সমং সৰ্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
 বিনশ্যংস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ১৮
 সমং পশ্যন্ হি সৰ্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
 ন হিনস্ত্যাঅনাঅনং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ১৯
 প্রকৃত্যেব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।
 যঃ পশ্যতি তথাঅনমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২০
 যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্মিন্নপশ্যতি ।
 তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্প্রাপ্নতে তদা ॥ ২১

[১২১]

কার্য্য কারণের হয় প্রকৃতিই হেতু ।
 সুখ দুঃখ ভোক্তারূপে প্রকৃতিই সেতু ॥ ১১
 প্রকৃতিস্থ পুরুষই গুণ ভোগ করে ।
 উচ্চ নীচ জন্মলাভ গুণসঙ্গে ধরে ॥ ১২
 ভর্তা ভোক্তা অহুমত্তা দ্রষ্টা মহেশ্বর ।
 আত্মার বসতিরূপে দেহ যার ঘর ॥ ১৩
 গুণ সহ প্রকৃতির জ্ঞান হয় যার ।
 যে ভাবেই থাকুক সে জন্মে নাকো আর ॥ ১৪
 কেহ ধ্যানে আত্মার আত্মা করে দরশন ।
 কেহ জ্ঞানে কেহ কর্মে করে বিলোকন ॥ ১৫
 জ্ঞানহীন অশু কেহ শুনি গুরু মুখে ।
 অনুসরি গুরুবাক্য মুক্ত হয় সূত্রে ॥ ১৬
 স্থাবর জঙ্গম আদি যাহা কিছু হয় ।
 ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রযোগে হয় সমুদয় ॥ ১৭
 অবিনাশী যেই আত্মা অব্যয় অক্ষয় ।
 সর্বভূতে দেখি তাঁকে সত্যদ্রষ্টা হয় ॥ ১৮
 সর্বভূতস্থিত আত্মা হেরি সমভাব ।
 সর্বত্র অহিংস হ'লে হয় মোক্ষলাভ ॥ ১৯
 প্রকৃতিই করে কর্ম্ম আত্মা কভু নয় ।
 দর্শনেতে এই তত্ত্ব সত্যদ্রষ্টা হয় ॥ ২০
 আত্মা হ'তে বিস্তারিত ভিন্ন ভিন্ন ভাব ।
 আত্মাতেই হেরি তাহা হয় ব্রহ্মলাভ ॥ ২১

[১২২]

অনাদিহ্মান্নিগুণহাং পরমাত্মাহয়মব্যয়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ! ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩২

যথা সৰ্ব্বগতং সৌন্দর্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সৰ্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহি নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃতঃ লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃতঃ প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪

ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুৰ্ভা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুষ্যন্তি তে পরম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগদগীতা-

সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ক্ষেত্র-

ক্ষেত্রজ-বিভাগ-যোগো

নাম ত্রয়োদশো-

অধ্যায়ঃ

[১২৩]

গুণহীন আদিহীন পরম অব্যয় ।

দেহে স্থিত সেই আত্মা কস্মে লিপ্ত নয় ॥ ৩২

সর্বব্যাপী সূক্ষ্মাকাশ যথা লিপ্ত নয় ।

সর্বদেহে স্থিত আত্মা সেইমত হয় ॥ ৩৩

এক সূর্য্য করে যথা জগৎপ্রকাশ ।

আত্মা তথা করে সর্ব দেহের বিকাশ ॥ ৩৪

প্রকৃতি বন্ধন হতে মুক্তি যদি হয় ।

ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রজ্ঞানে ব্রহ্মপদে লয় ॥ ৩৫

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত

— — —

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
 যজ্জাত্বা মুনয়ঃ সর্বৈ পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১
 ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।
 সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২
 মম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।
 সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩
 সর্বযোনিষু কৌন্তেয় ! মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
 তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪
 সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।
 নিবপ্নন্তি মহাবাহো ! দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫
 তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাং প্রকাশকমনাময়ম্ ।
 সুখসঙ্গেন বপ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬
 রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
 তন্নিবপ্নাতি কৌন্তেয় ! কর্ষসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭
 তমস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্ ।
 প্রমাদালশ্চানিদ্ৰাভিস্তন্নিবপ্নাতি ভারত ॥ ৮
 সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ষণি ভারত ।
 জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তু্যত ॥ ৯

চতুর্দশ অধ্যায়

ভগবান বলিলেন

সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান পুনঃ কহি ধনঞ্জয় ।
 যেই জ্ঞানে মুনিগণ ব্রহ্মপদে লয় ॥ ১
 এই জ্ঞানে হবে মম স্বরূপেতে স্থিতি ।
 প্রলয়েতে নাহি দুঃখ নাহি জন্ম নিতি ॥ ২
 মম যোনি মহদব্রহ্ম করি গর্ভাধান ।
 তাতে জন্মে ভূতবর্গ শোন মতিমান ॥ ৩
 যোনিজ মূর্তির হই বীজপ্রদ পিতা ।
 মহদব্রহ্ম যোনি তার প্রকৃতিই মাতা ॥ ৪
 ত্রিগুণের সৃষ্টি হয় প্রকৃতি হইতে ।
 তাহাতে অব্যয় আত্মা নিবদ্ধ দেহেতে ॥ ৫
 নির্মল যে সত্ত্বগুণ জ্ঞান-প্রকাশক ।
 দুঃখহীন সুখ জ্ঞানে বন্ধন কারক ॥ ৬
 রজোগুণ রাগাদ্বিকা তৃষ্ণাসঙ্গ জাত ।
 কর্মসঙ্গে বদ্ধজীব জেনো কুন্তীমূত ॥ ৭
 অজ্ঞানেতে জন্মে তম মোহ সৃষ্টি তায় ।
 আলস্বেতে বদ্ধ জীব প্রমাদ নিদ্রায় ॥ ৮
 সত্ত্ব সুখে, রজঃ কর্মে, তমঃ জ্ঞানে ছায় ।
 প্রমাদে আসক্ত হ'লে বুদ্ধি লোপ পায় ॥ ৯

[১২৬]

রজস্তুমশ্চাভিভূয় সৎ ভবতি ভারত ।
 রজঃ সৎ তমশ্চৈব তমঃ সৎ রজস্তথা ॥ ১০
 সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।
 জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাং বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১
 লোভঃ প্রবৃত্তিরাস্তঃ কৰ্মণামশমঃ স্পৃহা ।
 রজস্তুতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২
 অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিচ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।
 তমস্তুতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩
 যদা সত্ত্ব প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূং ।
 তদোত্তমবিদ্যাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪
 রজসি প্রলয়ং গতা কৰ্মসঙ্গিষু জায়তে ।
 তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫
 কৰ্মণঃ শূকৃতশ্লাহঃ সাদ্বিকং নির্মলং ফলম্ ।
 রজসন্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬
 সত্ত্বাং সংজায়তে জ্ঞানং রজসৌ লোভ এব চ ।
 প্রমাদমোহৌ তমসৌ ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭
 উদ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
 জঘন্যগুণবৃত্তিহা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮
 নাত্মং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দৃষ্টানুপশ্যতি ।
 গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯
 গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।
 জন্মমৃত্যুজরাহঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

[১২৭]

কভু সত্ত্ব রজঃ তমঃ করে পরাভূত ।
 কভু রজঃ সত্ত্ব তমঃ করে অভিভূত ।
 কভু তমঃ রজঃ সত্ত্ব করি পরাভব ।
 প্রকাশিছে স্থায়ী সত্ত্বা পরম বৈভব ॥ ১০
 সর্বদেহ দ্বারে যবে জ্ঞানের উদয় ।
 সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি বলি করহ নিশ্চয় ॥ ১১
 কামনা বাসনা লোভ কৰ্ম চেষ্টা আর ।
 অশান্তিতে রজঃ বৃদ্ধি জানিবে সবার ॥ ১২
 অপ্রকাশ অপ্রবৃত্তি ভ্রান্তি মোহ যত ।
 তমঃ বৃদ্ধি হ'লে হয় জেনো কুন্তীমূত ॥ ১৩
 সত্ত্বগুণবৃদ্ধি কালে যদি দেহত্যাগ হয় ।
 শুদ্ধ সত্ত্ব ব্রহ্মলোকে গতি সুনিশ্চয় ॥ ১৪
 রজোবৃদ্ধি কালে ম'লে নরলোকে যায় ।
 তমোবৃদ্ধি কালে ম'লে পশুযোনি পায় ॥ ১৫
 সাত্বিকে নির্মল সুখ দুঃখ রাজসেতে ।
 তামসে অজ্ঞান পার্থ কৰ্ম বিজ্ঞানেতে ॥ ১৬
 সত্ত্ব জ্ঞান রজে লোভ তমে মোহজাত ।
 প্রমাদ অজ্ঞান আর শোন বলি তাত ॥ ১৭
 সত্ত্বগুণে স্বর্গে গতি মর্ত্যে রজোগুণে ।
 তমোগুণে অধোগতি কেবা নাহি জানে ॥ ১৮
 গুণেতেই করে কৰ্ম হেরে দ্রষ্টা যবে ।
 গুণাতীত আত্মা জ্ঞানে আমাকেই পাবে ॥ ১৯
 দেহজাত গুণত্রয় করিলে বিজয় ।
 জন্ম মৃত্যুজরা মুক্ত ব্রহ্মগতি হয় ॥ ২০

[১২৮]

অৰ্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানৈতানতীতো ভবতি প্রভো ।
কিমাচারঃ কথম্ চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবৰ্ত্ততে ॥ ২১

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজ্জকৃতি ॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে ।
গুণা বৰ্ত্তন্ত ইত্যেব্যং যোহবতিষ্ঠতি নেদ্রতে ॥ ২৩
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দাত্মসংস্তুতি ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫
মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীতৈত্যান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্তাব্যয়স্ত চ ।
শাস্বতস্ত চ ধর্ম্মস্ত সুখশ্চৈকান্তিকস্ত চ ॥ ২৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বনি শ্রীমদ্ভগবদগীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগ-
যোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

[১২০]

অৰ্জুন বলিলেন

গুণাতীত কাকে বলে কহ জনার্দন ।
কি আচারে কি প্রকারে গুণাতীত হন ॥ ২১

ভগবান বলিলেন

প্রকাশ প্রবৃত্তি মোহ হইলে উদয় ।
বিদেহ নিবৃত্তি ইচ্ছা যাহার না হয় ॥ ২২
গুণেতেই করে কর্ম এই বুদ্ধি ষাঁর ।
বিচলিত নহে গুণে উদাসীন আর ॥ ২৩
লোষ্ট্রে স্বর্ণে সুখে দুঃখে কিংবা প্রস্তুরেতে ।
প্রিয়াপ্রিয়ে সমবুদ্ধি নিন্দায় স্তুতিতে ॥ ২৪
শত্রু মিত্রে এক ভাব মান অপমানে ।
কর্মফলত্যাগী জনে গুণাতীত গণে ॥ ২৫
অনন্ত ভক্তিতে যদি আমাকেই সেবে ।
গুণাতীত হয়ে হয় যোগ্য ব্রহ্মলাভে ॥ ২৬
ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমি অমৃত অব্যয় ।
ঐকান্তিক সুখ আমি ধর্মের আশ্রয় ॥ ২৭
চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয়ম্ ।

ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

অধশ্চোর্দ্ধং প্রমৃতাস্তস্ম শাখা

গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।

অধশ্চ মূলান্ননুসন্ততানি

কর্মানুবন্ধানি মনুষ্যলোকে ॥ ২

ন রূপমশ্বেহ তথোপলভ্যতে

নান্তো ন চাদিন্ চ সংপ্রতিষ্ঠা ।

অশ্বখমেনং সুবিকটমূল-

মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিদ্ভা ॥ ৩

ততঃ পদং তং পরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।

তমেব চাছুং পুরুষং প্রপদ্যে

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রমৃতা পুরাণী ॥ ৪

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা

অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

দ্বৈর্ভবিসমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-

র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তং ॥ ৫

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীভগবান বলিলেন

সংসার অশ্বথ বৃক্ষ অতি অপরূপ ।
 উদ্ধে মূল নিয়ে শাখা দেখিতে বিরূপ ॥
 বেদ ছন্দ পত্র তার শাশ্বত অব্যয় ।
 এই তত্ত্ব জ্ঞাত জনে বেদবেত্তা কয় ॥ ১
 অথঃ উদ্ধে শাখা তার রয়েছে বিস্তৃত ।
 গুণ দ্বারা সদা তারা হতেছে বর্দ্ধিত ॥
 বিষয় পল্লব তার ধর্ম্মাধর্ম্ম মূল ।
 নিম্নদিকে গতি যার দেখিতে অতুল ॥ ২
 সংসার বৃক্ষের রূপ দেখা নাহি যায় ।
 স্থিতি তার অন্তহীন আদি নাহি তায় ॥
 সেই বৃক্ষ দৃঢ়মূল কিবা কব আর ।
 অনাসক্তি অস্ত্রে তায় কাট অনিবার ॥ ৩
 সেই আদি বিষ্ণুপদ কর অব্ধেষণ ।
 লভি যাহা সংসারেতে না হয় পতন ॥
 যাহা হতে সংসারের চির প্রবর্তন ।
 তাঁহার শরণ আমি মাগি অনুক্ষণ ॥ ৪
 আসক্তি রহিত আর মান মোহহীন ।
 সদা আত্মনিষ্ঠ যিনি কামনাবিহীন ॥
 সুখ-দুঃখ-মুক্ত যিনি দ্বন্দ্ব নাহি ধার ।
 অব্যয় সে বিষ্ণুপদে গতি হয় তাঁর ॥ ৫

[১৩২]

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।

যদৃগহা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গ্রহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াং ॥ ৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ভ্রাণমেব চ ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়াং বিবয়ানুপসেবতে ॥ ৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।

বিমূঢ়া নানুপশন্তি পশন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০

যতন্তো যোগিনৈশ্চেনং পশন্ত্যাত্মবস্থিতম্ ।

যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তং তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

গামাংশ্চ চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুষ্পামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূহা রসাত্মকঃ ॥ ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূহা প্রাণিনাং দেহমাত্মিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪

সর্বশ্চ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মৃতঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো

বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫

সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি যাকে প্রকাশিতে নারে ।
 সেই মোর ধামে গেলে জন্ম নাহি ধরে ॥ ৬
 জীবলোকে জীব মোর অংশ সনাতন ।
 প্রকৃতিস্থ ইন্দ্রিয়াদি করে আকর্ষণ ॥ ৭
 ইন্দ্রিয়ের সহ জীব জন্ম মৃত্যুকালে ।
 দেহান্তর লাভ করে ইহ পরকালে ॥
 পুষ্পগন্ধ বায়ু যথা করয়ে গ্রহণ ।
 জীব তথা ইন্দ্রিয়াদি করে আকর্ষণ ॥ ৮
 চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা হৃক মন সহ ।
 বিষয়ের ভোক্তা জীব হয় অহরহ ॥ ৯
 দেহে কিম্বা দেহান্তরে যবে ভোগে রত ।
 অজ্ঞানী না দেখে জীবে দেখে জ্ঞানী যত ॥ ১০
 যত্নশীল যোগী দেখে আত্মা দেহে স্থিত ।
 অজ্ঞানীর সম্বন্ধেও নহে লক্ষ্যীভূত ॥ ১১
 সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি তেজ জগৎ ভাসক ।
 আমারি সে তেজ হয় সর্ব্ব প্রকাশক ॥ ১২
 স্বীয় শক্তি বলে পৃথ্বী করিয়া ধারণ ।
 চন্দ্র তেজে সর্ব্বৌষধি করি যে পোষণ ॥ ১৩
 দেহমধ্যে জঠরাগ্নি বায়ু প্রাণাপান ।
 চতুর্বিধ অন্ন আমি করি পচ্যমান ॥ ১৪
 সকল হৃদয় মাঝে মোর অবস্থিতি ।
 আমা হতে স্মৃতি জ্ঞান পুনঃ যে বিস্মৃতি ॥
 বেদের জ্ঞাতব্য হই কর্ত্তা বেদান্তের ।
 বেদবেত্তা জেনো মোরে পিতা সকলের ॥ ১৫

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
 ক্ষরঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬
 উত্তমঃ পুরুষস্তৃত্বঃ পরমাত্মেত্যাদাহতঃ ।
 যো লোকত্রয়মাবিশ্ণু বিভর্তব্যায় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭
 যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
 অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮
 যো মামেবসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
 স সৰ্ববিদ্বজ্জতি মাং সৰ্বভাবেন ভারত ॥ ১৯
 ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াহনঘ ।
 এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্মাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং
 শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে পুরুষোত্তমযোগে
 নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ

ক্ষরাক্ষর পুরুষ জগতে বিখ্যাত ।
কুটস্থ অক্ষর জেনো ক্ষর সর্বভূত ॥ ১৬
উত্তম পুরুষ যিনি পরামাত্মা নাম ।
অব্যয় ঈশ্বর তিনি পালেন তিন ধাম ॥ ১৭
অক্ষরের শ্রেষ্ঠ আমি ক্ষরের অতীত ।
উত্তম পুরুষ তাই ত্রিলোক বিদিত ॥ ১৮
আমাকে পুরুষোত্তম জেনে মোহহীন ।
সর্ববেত্তা হয়ে মোর ভজনেতে লীন ॥ ১৯
গুহ্যতম শাস্ত্র বাক্য কহিলু তোমায় ।
কৃতকৃত্য বুদ্ধিমান হইবে তাহায় ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ষোড়শোধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্ন্বাচ

অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
 দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আৰ্জ্জবম্ ॥ ১
 অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
 দয়া ভূতেশ্বলোলুপ্তং মর্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২
 তেজঃ ক্রমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
 ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্তু ভারত ॥
 দন্তো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ ।
 অজ্ঞানং চাভিজাতস্তু পার্থ সম্পদমাস্থরীম্ ॥ ৪
 দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াম্বরী মতা ।
 মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥ ৫
 ঘো ভূতসর্গে া লোকেহস্মিন্ দৈব আস্থর এব চ ।
 দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্থরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬
 প্রবৃত্তিক্ নিবৃত্তিক্ জনা ন বিছরাম্বরাস্থরাঃ ।
 ন শৌচং নাপি চাচারো ন সতং তেষু বিদ্বতে ॥ ৭
 অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহরনীশ্বরম্ ।
 অপরস্পরসম্মতং কিমত্র্যং কামহৈতুকম্ ॥ ৮
 এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টান্মানোহল্লবুদ্ধয়ঃ ।
 প্রভবন্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীভগবান বলিলেন

ত্যাগ শান্তি ক্রমা দয়া অহিংসা অভয় ।
 সত্য দান তপ যজ্ঞ যত গুণচয় ॥
 স্থিতি লজ্জা শৌচ তেজ অদ্রোহ মৃদুতা,
 অচাপল্য চিত্তশুদ্ধি অহিংসা স্বাক্ষুতা ।
 পরচর্চা লোলুপতা নাহি অভিমান ॥ ১—৩
 এই সব গুণ দৈবী সম্পদের দান,
 দম্ব দর্প নিষ্ঠুরতা ক্রোধ অভিমান ।
 আসুরি সম্পদ এরা আর যে অজ্ঞান ॥ ৪
 মোক্ষতে দৈবী সম্পদ বন্ধনে আসুরী ।
 ত্যজ শোক জন্ম তব দৈব লক্ষ্য করি ॥ ৫
 দৈব আসুরী নামে ভূত সৃষ্টি হয় ।
 দৈব প্রোক্ত এবে কহি আসুরি যা হয় ॥ ৬
 প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিবা অসুর না জানে ।
 শৌচ সত্যহীন এরা আচার পালনে ॥ ৭
 সত্য নহে সত্যহীন বিশ্বচরাচর ।
 কামেতেই সৃষ্টি হয় হেতু নারী নর ॥ ৮
 নষ্টবুদ্ধি উগ্রকর্মা নিকোঁধ যে হয় ।
 জগত ধ্বংসের তরে তাদের উদয় ॥ ৯

काममाश्रित्य हृत्पूरं दम्भमानमदाश्रिताः ।
 मोहाद् गृहीताहसद्ग्राहान् प्रवर्तन्तेहृत्पुच्छिताः ॥ १०
 चिन्तामरिमेयाङ्गं प्रलयास्तामुपाश्रिताः ।
 कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११
 आशापाशशतैर्वर्द्धाः कामक्रोधपरायणाः ।
 ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसङ्ग्रहान् ॥ १२
 इदमद्य मया लक्ष्मिदं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
 इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३
 असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
 ईश्वरोहमहं भोगी सिद्धोहहं बलवान् सुखी ॥ १४
 आद्योहभिजनवानस्मि कोहत्तोहस्ति सदृशो मया ।
 यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ज्ञानविमोहिताः ॥ १५
 अनेकचिन्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।
 प्रशन्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेहृत्पुच्छे ॥ १६
 आत्मसन्तापिताः स्तब्धा धनमानमदाश्रिताः ।
 यजन्ते नामयज्जन्ते दन्तेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७
 अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं संश्रिताः ।
 मामात्मपरदेहेषु प्रद्विबन्तोहभ्यसूयकाः ॥ १८
 तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।
 क्षिपाम्यजस्रमशुभानाश्वरीष्वेव योनिषु ॥ १९
 आश्वरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।
 मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यास्त्यधमां गतिम् ॥ २०

মদমত্ত দম্তমানে হয়ে সমন্বিত ।
 অন্তহীন কামনায় হয়ে বশীভূত ॥
 মোহবশে অনুচিত্তে হয়ে নিমগন ।
 অশুচি অশুভব্রত করে আচরণ ॥
 আমরণ কত চিন্তা হৃদয়ে তাহার ।
 কামভোগ পুরুষার্থ অন্ম সব ছাড় ॥
 কতশত আশাবদ্ধ ক্রোধে বশীভূত ।
 ভোগ হেতু অর্থলাভে সদা রয় রত ॥ :০—১২
 সিদ্ধ মোর মনোরথ পুনঃ সিদ্ধ হবে ।
 পেয়েছি যে ধন পুনঃ পাব তাহা ভবে ॥
 বধেছি শত্রুকে মোর বধিব আবার ।
 সিদ্ধ ভোগী বলবান কেবা আছে আর ॥
 ঈশ্বর কুলীন আমি সুখী ধনবান ।
 যজ্ঞদান করি সদা কে মোর সমান ॥
 এই ভাবি অজ্ঞানেতে হইয়া মোহিত ।
 কামাসক্ত মোহে বদ্ধ নরকে পতিত ॥ ১৩—১৬
 অহংকৃত ধনে মত্ত দম্ত সহকারে ।
 নামে মাত্র যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠান করে ॥
 বল দর্প কাম ক্রোধ দ্বেষ অহংকারে ।
 স্বীয় পর দেহে মোরে বিদ্বেষ যে করে ॥ ১৮
 দেবী ত্রুর নরাধম এই নরগণ ।
 হিংস্র যোনিতে সবে করি নিক্ষেপণ ॥ ১৯
 লভিয়া অশুর যোনি নাহি পায় মোরে ।
 সেই হেতু অধোগতি লভে বারে বারে ॥ ২০

ত্রিবিধং নরকশ্রেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।

কাম ক্রোধস্তথা লোভস্তদ্বাদেতন্নয়ং তজ্জ্ঞেং ॥ ২১

এতৈর্বিমুক্তঃ কোন্তেয় তমোদ্বারৈর্জিভিন'রঃ ।

আচরত্যাগ্ননঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুর্মিহাইসি ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-

সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে দৈবাস্মর

সম্পদ্বিভাগযোগো নাম

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

LIBRARY

No.

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

BANARAS.

[১৪১]

কাম ক্রোধ লোভ আদি নরকের দ্বার ।
আত্মনাশ ইহাদের কর পরিহার ॥ ২১
ত্রিবিধ নরক দ্বার হতে মুক্ত যারা ।
সাধিয়া কল্যাণ স্বীয় মুক্ত হয় তারা ॥ ২২
শাস্ত্রবিধি অবহেলি চলে নিজ মতে ।
সিদ্ধি স্মৃথ পরাগতি লভিবে কি পথে ॥ ২৩
সর্বকার্যে জেনো পার্থ শাস্ত্রই প্রমাণ ।
শাস্ত্রবিধি জেনে কৰ্ম কর মতিমান ॥ ২৪

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।



মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীহরিকথা	৩.০০	বন্ধুকরণা কণিকা	১.৫০
চন্দ্রপাত	১.২০	মহানাম মহাকীর্তন আশ্বাদন	২.০০
উদ্ধারণ	১.০০	আমেরিকা পথে	
সংকীর্তন-পদাবলী	১.৭৫	ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী	১.৫০
সংকীর্তন-পদামৃত	১.২৫	মিশনারী ও ভারতীয় সাধু	১.৫০
চন্দ্রপাত মাধুর্যাবিন্দু	২.০০	৫ মের বাণী	১.৫০
মহামৃত্যু-রত্ন	২.০০	ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বজ্যোতিঃ	১.৫০
মহাকীর্তন মাধুরী	১.৫০	৫ মের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধু	১.২৫
শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-ভরঙ্গিনী		হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু	১.৭৫
১ম—১০ম খণ্ড	২৭.৫৫	গীতাধ্যান ১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ খণ্ড	১৫.০০
বন্ধুবর্তা	৫.০০	সপ্তশতী চণ্ডীচিন্তা	৪.০০
ব্রহ্মগায়ত্রী	১.৬০	উদ্ধব-সন্দেশ	৩.০০
উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ	৩.০০	বন্ধুলীলা স্থধানিধি	
শ্রীশ্রীবন্ধুস্মরণ মঙ্গল	১.৭৫	১ম খণ্ড ৩.০০, ২য় খণ্ড ৩.৫০	
স্মরণ-মঞ্জরী	১.৩৭	ভাগবত ১ম খণ্ড	১৫.০০
বিশ্বধর্ম্ম	১.২৫	,, ২য় ,,	৮.৫০
শ্রীশ্রীবন্ধু স্তোত্র রত্নাবলী	১.২০	,, ৩য় ,,	৮.৫০
গৌরকথা ১ম খণ্ড	২.০০	,, ৪র্থ যন্ত্রস্থ	
২য় ২.৫০, ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ		মহানামব্রতের	
শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী	১.৫০	পাঁচটা ভাষণ	২.৫০
শ্রীগৌরস্মরণ মঙ্গল	১.০০	জয়নিতাইদেবের ইষ্টগোষ্ঠী	১.০০
শ্রীহরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল	১.৭৫	শতবার্ষিকী স্মরণিকা	
শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন	১.৫০	(বাংলা) ৬.৫০	
রাধাকৃষ্ণ স্মরণ মঙ্গল	১.৫০	ঐ স্মরণিকা	
গোপীমহা মাধুরী	১.৫০	(ইংরেজী) ১০.০০	
বন্ধুগীতি চন্দ্রমাঙ্গলি	১.৭৫		
বন্ধু কে !	১.৫০		

প্রাপ্তিস্থান

মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫২, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-১১।
 মহানাম মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। ভাগবত সঙ্কলন, ১৬/সি,
 ফার্ম রোড, কলিকাতা-১২। ফোন : ৪৬-১৪৫৮ মহেশ লাইব্রেরী,
 ২/১, শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা। সংস্কৃত পুস্তক
 ভাণ্ডার, ৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বন্ধুপ্রিয়া পুস্তক
 ভাণ্ডার, ৪, তালতলা লেন, কলিকাতা-১৪।

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ : রিপোডাক্সন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৬